আব্দুল ওয়াহহাব আল-তুরাইরী

হাদিসুল গাদীর

আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) এর সাথে
খুম্ম জলাভূমির পাদদেশে

ভাষান্তর ও টিকা

আতাউল্লাহ হাশেম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সূচীপত্র

প্রারম্ভিকা

বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত। যে শহরটিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং শহরটিও তাঁকে ভালোবেসেছিলো এর প্রতি তিনি ফিরে তাকালেন... অনেক দিন আগে একবুক কষ্ট নিয়ে এখান থেকে থেকে চলে যাওয়ার পরও যার প্রতি তাঁর মায়ার বাঁধন কখনো ছিন্ন হয়নি।
তাঁর চারপাশ ঘিরে আছে সঙ্গিসাথীগণ... তাঁদের নিয়ে তোলা প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি বুঝতে পারছেন, এবারই শেষবার! আর ফিরে আসা হবে না এখানে!
প্রত্যাবর্তনহীন একেবারেই চলে যাওয়া!
জীবনের আয়ু ফুরিয়ে এলো প্রায়... দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে... কত কথা জমে আছে... পরম যত্নে যার কিছু তিনি গুছিয়ে রেখেছিলেন। সফরের শেষলগ্ন নিকটবর্তী, কাফেলার সাথীরা দীর্ঘ সফর শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত, এমনি সময় সে সব কথামালার কিছু কথাকে সবিশেষ পূর্ণতা প্রদান করার ইচ্ছে করলেন।
মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি একটি প্রশস্ত জলাধারের পাড়ে থামলেন... যে জলাধার তাঁদের সবার জন্য যথেষ্ঠ... সবাইকে থামতে ও একত্রিত হতে আদেশ দিলেন। সকলেই যেন পরিপূর্ণ ভাবে তাঁকে শুনতে পায় সেজন্য একটু উঁচু স্থানে দাঁড়ালেন। কিন্তু উপস্থিত প্রিয় সহচরগণ তো আগে থেকেই তাঁকে এর চেয়েও বহু উঁচু হৃদয়সৌধে আসীন করে রেখেছেন।
একে একে উপস্থিত সবার ওপর তিনি নজর বুলিয়ে নিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এবং অদ্বিতীয়। কারো বিকল্পই কেউ নন। কিন্তু এবারের উপলক্ষ তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত প্রিয় সহচর আলী’র জন্য। তিনি এবার সবার আগে। একটু পরের ঘোষিত বাক্যমালা এবং আজকের এই উপস্থিতি সবকিছুই মূলত তাঁকে ঘিরে, জলাধারটি এই ঐতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী হতে চলেছে আজ।
সবার চোখে উৎসুক দৃষ্টি, সবকটি শ্রবণেন্দ্রিয় এখন একদিকে মনোযোগী, কেউ কেউ গ্রীবা উঁচু করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরেকটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করছেন। এই গুরুগম্ভীর পরিবেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম দ্বিধাহীন স্পষ্ট ভাষায় সে কথাগুলো বললেন, এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তা বুকে ধারণ করলেন। কেউ কোন অংশ ভুলে গেলে অন্য কেউ সেটা মনে রাখলেন... বিস্মৃতিপ্রবণ মানুষের মন যদি কিছু ভুলেও যায় তা চিরকালের জন্য অংকিত হয়ে রইলো সেখানকার পাথরে।

আমি আমার এই বইয়ে সেই জলাধারের পাদদেশেই শব্দের মালাগুলো সাজিয়েছি... অনুধাবন করতে চাচ্ছি অস্পৃশ্য সেই সময়কে... কেমন ছিল আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর[1] অবস্থান সাহাবায়ে কেরামদের মনে... বুঝতে চাচ্ছি আমাদের হৃদয়েই বা তাঁর স্থান কতটুকু।

এই জলাধারের পাড়ে... আমরা আমাদের অন্তঃকরণ দিয়ে সেখানে সেভাবেই দাঁড়ানোর চেষ্টা করবো যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে সাহাবীরা দাঁড়িয়েছিলেন।

আবেগ-অনুভূতির মিশেলে শুনতে চেষ্টা করবো যেমনভাবে তাঁরা শুনেছিলেন... অন্তরের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করবো নবীজী (সাঃ) যা বলেছেন সেদিন, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করবো সে ঘটনা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এর তাৎপর্য।

বস্তুত: হৃদয়ের ভালোবাসা বিবেকের পথকে আগলে দাড়ায়না, অথবা ভাবনার স্রোত আবেগের সলতেকে নিভিয়ে দেয়না।

চলুন তাহলে সেই জলাধারের উদ্দেশ্যে, যেখানে ঘটেছে এই ঘটনা, ঘোষিত হয়েছে মর্যাদার অবিস্বরণীয় এক ইশতেহার... বিদায়ের রাগিণী বাজিয়ে শেষ ভাষণ সমূহের একটি ভাষণে... জীবন সায়াহ্নে প্রায়...।

আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ
(০২/০২/১৪৩৭ হিজরী)।

---

(1) মুহতারাম লেখক বক্ষ্যমাণ বইয়ের অনেক স্থানে সাইয়্যিদুনা আলী ইবনু আবী তালিব এর নামের পর "আলাইহিস সালাম" দোয়া সূচক বাক্যের ব্যবহার করেছেন, যা নবী- রাসুলগন ব্যতিত অন্য সম্মানিত কেউ যেমন ফিরিশতা বা আহলে বাইত এর সদস্যবৃন্দের জন্যও ব্যবহার করা সামগ্রিক ভাবে জায়েয, বিশেষ করে দোয়া হিসেবে। কিন্তু যখন এই ধরনের বাক্য কোন অঞ্চলে নির্দিষ্ট কোন পরিভাষা বুঝাতে, অথবা এমন কোন চিন্তাধারার লালন-পালন ও প্রসারে ব্যবহৃত হয় যা মুসলিম উম্মাহর বড় অংশের চিন্তা-চেতনার বিরোধী তখন এর থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। এ জন্য আমাদের উপমহাদেশীয় অবস্থা বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত "রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু" অথবা সংক্ষেপিত ভাবে "(রাঃ)" ব্যবহার করা হয়েছে।

গাদীরে খুম্ম

"গাদীরে খুম্মে" আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আলী ইবনু আবি তালেব (রাঃ) কে সম্মান ও মর্যাদার এমন বিরল মুকুটে ভূষিত করা হয়েছিলো যার দ্যুতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। এ আয়োজন নিছক মর্যাদা ঘোষণার কোন মঞ্চ ছিলোনা, বরং তা ছিলো মর্যাদার মুকুট ও স্বীকৃতি প্রদানের মঞ্চ। কেননা তিনিই তো ছিলেন ঐ ব্যক্তি যাকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেনঃ "একমাত্র মু'মিনই তাঁকে ভালোবাসবে, এবং মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে অপছন্দ করবেনা" (১)।

যার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) আরো বলেছিলেনঃ

أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ غير أنه لا نبي بعدي.

অর্থাৎ- তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তুমি আমার নিকট মুসা আলাইহিস সালামের কাছে হারুন আলাইহিস সালামের মর্যাদায় থাকবে? তবে হ্যাঁ, পার্থক্য এতটুকু যে আমার পরে আর কোন নবী নেই (২)।

তিনিই সে ব্যক্তি যাকে আবর্তিত করে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

أنت مني وأنا منك

অর্থাৎ- তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে (৩)।

এবং তিনিই হলেন সেই মানব যার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) কে ভালোবাসেন, এবং আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)ও তাঁকে ভালোবাসেন (৪)।

সুবহানাল্লাহ! মর্যাদার কত বিরল উপলব্ধি যে, আলী (রাঃ) এই নশ্বর জমীনে পদচারণা করছেন এবং তিনি সম্যক অবগত যে, আরশে আজীম থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভালোবাসেন, এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাঁকে ভালোবাসেন!

ইসলামের ইতিহাসের শুরুলগ্ন থেকেই আলী (রাঃ) ইসলামের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। শৈশবের ভালো-মন্দ বুঝার বয়স থেকেই ইসলাম তাঁর মন মননে প্রোথিত। রিসালাতের দীর্ঘ তেইশ বছরের পুরো সময়টি আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর সাথে

ছিলেন। প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে ব্যয় করেছেন। বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের সকল শক্তি, শ্রম, সম্পদ, ধৈর্য এবং প্রচেষ্টাকে।

তেইশ বছরের সুদীর্ঘ সময়কালকে তিনি রাসূল (সাঃ) এর সাথে কাটিয়ে দিয়েছেন, যাকে রাসুল (সাঃ) বড় বড় সমস্যা ও বিপদের মুকাবিলা করার জন্য জমিয়ে রাখতেন।

তেইশ বছরে অসংখ্য মানুষ একের পর এক দল হিসেবে রাসূল (সাঃ) এর সাথে শরীক হয়েছেন, কিন্তু আলী (রাঃ) ছিলেন তাঁদের সবার মাঝে প্রথম দিকের, এবং তাঁর সান্নিধ্যে থাকা লোকদের মাঝে অন্যতম (৫)।

তেইশ বছর সময় অতিবাহিত হলো, আলী (রাঃ) এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন ভালোবাসার পাত্র হিসেবে, বংশীয় ও রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় হিসেবে, বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে এবং প্রতিবেশী হিসেবে।

আপনি আলী (রাঃ) কে রাসূল (সাঃ) এর সাথে কি পরিচয়ে পরিচয় করিয়ে দিবেন? আপনি কি বলবেন যে তিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন? রাসূল (সাঃ) তাঁর ব্যাপারে বলেছেনঃ

يحبه اللهُ و رسولهُ

অর্থাৎ- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) তাঁকে ভালোবাসেন (৬)।

আপনি কি বলবেন যে তিনি তাঁর বংশীয় আত্মীয় ছিলেন? রাসূল (সাঃ) ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। তাঁদের উভয়ের পিতা ছিলেন পরস্পর সহোদর।

আপনি কি তাঁদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আত্মীয়তা সম্পর্কে জানতে চাইবেন? তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর মেয়ে এবং জান্নাতের নারীদের সর্দার ফাতিমা (রাঃ) এর স্বামী। তাঁর মাধ্যমে তিনি তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁকে ফাতিমা (রাঃ) এর জন্য নিরাপদ ও বিশ্বস্ত মনে করেছেন।

নাকি তাকে তাঁর প্রতিবেশী বলবেন? তাঁর বাড়ী ছিল রাসূল (সাঃ) এর বাড়ীর সবচেয়ে কাছের বাড়িটি। রাসূল (সাঃ) এর বাড়ীর কোলের মধ্যেই ছিল তার বাড়ীর অবস্থান। সেগুলোর মধ্যে এটি ছিল একটি বাড়ীর মত। এজন্য ইবনু উমর (রাঃ) কে আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, রাসূল (সাঃ) এর বাড়ীর সাথে তাঁর বাড়ীর অবস্থানটির দিকে খেয়াল করুন (৭)। অর্থাৎ তাঁর মর্যাদা এবং রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাঁর নৈকট্যতা বুঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ঠ।

রাসূল (সাঃ) আলী (রাঃ) এর সন্তানদেরকে নিজের সন্তান হিসেবে উল্ল্যেখ করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

ان ابني هذا سيدٌ، و لعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.

অর্থাৎ- আমার এ সন্তান হলো নেতা। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের বিশাল দুটি গ্রুপের পারস্পরিক সমস্যা মীমাংসা করে দিবেন (৮)। যিনি ছিলেন সায়্যিদুনা হাসান বিন আলী বিন আবি তালেব রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা 'আনহুমা।

যাঁদের ব্যাপারে নবীজী (সাঃ) বলেছেনঃ

إني لما رأيتُ ابنَيَّ هذين يمشيان؛ لم أصبر أن قطعتُ كلامي ونزلتُ إليهما.

অর্থাৎ- আমি যখন আমার এই দুই সন্তানকে হাটতে দেখেছি তখন আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারিনি, আমি কথা বন্ধ রেখে তাদের কাছে ছুটে গিয়েছি (৯)। তাঁরা ছিলেন আলী বিন আবু তালেবের এর দুই সন্তান হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা 'আনহুম।

আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর ডানহাত সদৃশ যা তাঁকে সাহায্য করত। তিনি ছিলেন তাঁর সেই অস্ত্র যা দিয়ে তিনি দুশমনকে আঘাত করতেন। শত্রুর মুখোমুখি হলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতেনঃ (হে আলী, দাঁড়াও, অগ্রসর হও!)। কোথাও কোন বিপদের কিছু থাকলে সেটি মোকাবেলা করার জন্য আলী (রাঃ) কে এগিয়ে দিতেন, যেমনটি রাসূল (সাঃ) তাঁকে বলেছিলেন বদরের যুদ্ধে, তিনি যেন সর্বপ্রথম শক্তি প্রদর্শনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন (১০)।

আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর আমানাত আদায়কারী। মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন মানুষের কাছে তাদের আমানতগুলো পৌছে দেয়ার জন্য (১১)।

আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে তার রিসালাতের ঘোষক। তিনি হজ্জের মওসূমে তাঁকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন মানুষের কাছে সূরা তাওবাহ পড়ে শুনানোর জন্য; মশরিকদের সাথে পূর্বের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা ও অঙ্গীকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, এবং এই ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ্ব করতে পারবেনা। কোন বস্ত্রহীন ব্যক্তি কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা (১২)।

এর মাধ্যমে কাবা ঘর তাওহীদ তথা একত্ববাদের নির্ভেজাল অবস্থানে ফিরে আসে, রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে আলী (রাঃ) এর এই ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে মক্কাকে ইসলামের জন্য নিবেদিত করা হয়।

তেইশ বছর পর সেখানে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসে। এই সময় লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেন, উম্মতের জন্য তাঁর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলেন। মুসলমানরা দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষার পর রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ আদায় করে মুসলিম উম্মাহ হিসেবে পূর্ণ হয়ে উঠলো। হজ্ব শেষে রাসূল (সাঃ) মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে সাহাবায়ে কেরাম ও উপস্থিত জনতাকে থামালেন।

সেখানেই আলী (রাঃ) কে বিরল সেই মর্যাদার মুকুটে ভূষিত করা হয়। তাঁর কৃতিত্ব ও গুনাবলীকে পূর্ণ করে দেয়া হয়, এবং আলী (রাঃ) এর সুউচ্চ মর্যাদাকে সবার সম্মুখে উচ্চকীত করে তোলা হয়। যেন গাদীরে খুম্মের এই অবস্থান আলী (রাঃ) এর জন্যই ছিলো [2], মর্যাদার এই শীর্ষ চূড়ায় তাঁকে অধিষ্ঠানের সব কিছুই ছিলো সুস্পষ্ট, গোপন বা অস্পষ্টতার কিছুই ছিলোনা সেখানে।

অতএব প্রিয় পাঠক; চলুন আমরা এখানে গাদীরে খুম্মের ঘটনা ও বর্ণনাগুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার কিছু প্রয়াস পাই, তৎকালিন গুরুগম্ভীর সে অবস্থাটা বুঝার চেষ্টা করি এমন ভাবে যেন আমরা রাসূল (সাঃ) এর সাথেই আছি তিনি যখন লোকজনকে সেখানে থামার আদেশ দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে উপস্থিত থেকে তাঁর কথা সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন আমরা হৃদয় জগতের মাধ্যমে সেভাবেই শুনার চেষ্টা করবো, যাতে আমরাও সে ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারি এবং এ মহান উপলক্ষকে ধারণ করতে পারি। কেননা সেখানে ছিলো আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর বক্তব্য; আর কতই না সুমহান ও শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তিত্ব যিনি এখানে কথা বলছেন -(সাঃ)-! এবং কত না মর্যাদাবান তিনি যার ব্যাপারে বলা

(2) স্মর্তব্য যে, উল্ল্যেখিত ভাষণে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, এগুলোর মাঝে অন্যতম বিষয় ছিলো হযরত আলী (রাঃ) এর ফাযায়েল ও মানাক্বেব সম্পর্কিত এই বাক্যগুলো যা কেন্দ্র করে বক্ষ্যমাণ বইয়ের আলোচনা।

হচ্ছে, -আলী (রাঃ)-! প্রতিটি মুমিন নর-নারীর অন্তরে আলী (রাঃ) এর মর্যাদা এবং সম্মানের আখ্যান নিয়ে এর চেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ কথা আর কি হতে পারতো?!

❍ ❍ ❍

গাদীরের পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট

গাদীরের এই ঘটনার সাথে আলী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে ঘটা কিছু কাজ ও অবস্থানের সংযোগ ছিলো। বিদায় হজ্বে আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে রাসুল (সাঃ) সাথে যোগ দেয়ার পূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত সাহাবীদের কারো কারো নিকট প্রশ্নের উদ্রেক করেছিলো এবং অস্পষ্টতা হেতু তাঁরা তাঁকে এই নিয়ে কিছুটা তিরস্কারও করেছিলেন, পরবর্তীতে যা রাসূল (সাঃ) এর নিকটও উত্থাপন করা হয়।

বস্তুত প্রথমদিকে যেসব অবস্থানের ব্যাপারে তাঁরা তিরস্কার করেছিলেন এবং তাঁদের মনে নেতিবাচক ধারণা চলে এসেছিল সেগুলো দূর করার জন্যই আলী (রাঃ) কে সম্মান ও মর্যাদার এই মুকুটে ভূষিত করা হয়েছিলো, এবং তাঁর গুণাবলীকে জনসম্মুখে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছিলো, এবং প্রতিটি মু'মিন ও মু'মিনার উদ্দেশ্যে তাঁর বিলায়াত ও বন্ধুত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

চলুন! এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা ও রেওয়ায়েত যার মাধ্যমে ঘটনার পূর্বাপর সকল বিষয় আমাদের নিকট স্পষ্ট হবে সেগুলো একটু বিশ্লেষন করে দেখা যাক (১৩)।

রাসূল (সাঃ) হাওয়াজিন ও তায়িফ যুদ্ধের পর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন কিছু যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। খালিদ (রাঃ) তাদের উপর বিজয়ী হলেন এবং শত্রুদের রেখে যাওয়া সম্পদ ও যুদ্ধ বন্দীদেরকে মালে গানীমাত হিসেবে অধিগ্রহণ করলেন। এবং রাসূল (সাঃ) কে খবর পাঠালেন এমন কাউকে প্রেরণ করার জন্য যিনি "ফাই"[3] এর এক পঞ্চমাংশ পৃথক করবেন।

রাসূল (সাঃ) আলী (রাঃ) কে পাঠালেন যেন তিনি বিজয় পরবর্তী কাজ সম্পন্ন করতে পারেন এবং শত্রুদের রেখে যাওয়া সম্পদ হস্তগত করে সেগুলোর এক পঞ্চমাংশ আলাদা করতে পারেন([4*])। এবং এর সাথে গোত্রসমূহকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি

---

(3) ফাই হলো এমন সম্পদ যা যুদ্ধরত কাফিরদের থেকে লড়াই বিহিন মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

(4*) ইসলামী যুদ্ধ পরিভাষায় এটিকে তাখমিস বলা হয়, অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালে গানীমতকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা, এবং এর এক পঞ্চমাংশকে বাইতুল মাল ও অন্যান্য সাধারণ খাতের জন্য পৃথক করে রাখা, বাকী

লিখলেন যা যুদ্ধের পূর্বে যেন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এরই সাথে নির্দেশ দিলেন যে, খালিদ (রাঃ) এর বাহিনী যেন নিজেদের অবস্থা হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয় যে তাঁদের মাঝে কেউ চাইলে তিনি এখন ফিরে আসতে পারবেন, অথবা কেউ চাইলে আলী (রাঃ) এর সাথে বাকী পথ একসাথে চলতে পারবেন।

এটা তৎকালীন সেনাবাহিনীর মাঝে প্রচলিত একটি পদ্ধতি ছিলো যে,পরবর্তী বিভিন্ন গ্রুপ ধাপে ধাপে আগের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যোগ দিতো, এবং তাঁদের কেউ কেউ নির্দিষ্ট মিশন শেষ করে ফিরে আসতো। যাতে পরিবারের সাথে পূর্ববর্তীদের কষ্টকর অনুপস্থিতি দীর্ঘ না হয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে আলী (রাঃ) খালিদ (রাঃ) থেকে সেনাপতির দায়িত্ব এবং গানীমতের মালামালের হিসাব বুঝে নিলেন। সবাইকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন যে যিনি যেতে চান তিনি যেতে পারেন এবং যিনি থাকতে চান তিনি থাকতে পারেন। সে মোতাবেক যারা থাকার তাঁরা থেকে গেলেন এবং যারা যাওয়ার তাঁরা চলে গেলেন।

আলী (রাঃ) গানীমাতের মালামাল গ্রহন করে বিজয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখলেন। হামদান গোত্রের কাছে গেলে তারা সবাই দলবেঁধে বেরিয়ে আসল। আলী (রাঃ) সাথীদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন এবং সবাইকে সারিবদ্ধ করে তাদের সামনে আসলেন। কাছে গিয়ে রাসূল (সাঃ) এর চিঠি পড়ে শুনালেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। আলী (রাঃ) তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ রাসূল (সাঃ) কে জানালে রাসূল (সাঃ) সিজদায় লটিয়ে পড়লেন এবং বললেনঃ

السلام على همدان

অর্থাৎ- হামদান গোত্রের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক।

আলী (রাঃ) গানীমাতের মালামালকে নিয়মানুসারে পাঁচ ভাগে ভাগ করলেন। নারী বন্দীদের মাঝে একজন সুন্দরী রমনী ছিল। পাঁচ ভাগে ভাগ করার পর দেখা গেলো যে তিনি খুমুসের এক পঞ্চমাংশের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত হয়েছেন, অতঃপর সেটি পাঁচ

সম্পদ সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করার পূর্বে। বিস্তারীত দ্রষ্টব্যঃ আল-মিসবাহুল মুনীর, তাজুল 'আরুস, এবং আল-মাওসুও'আতুল ফিকুহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ (১১/৫৯)।

শব্দের সঠিক ব্যখ্যার জন্য দেখুনঃ লিসানুল আরব (৬/৭০), (খা, মিম, সিন) অক্ষর, এবং হাশিয়াতুল সিন্ধি 'আলা মুসনাদি আহমাদ।

ভাগে ভাগ করার পর তিনি রাসূল (সাঃ) এর বংশের ভাগে পড়েছেন। অতঃপর সেটি পাঁচ ভাগ করার পর দেখা গেলো তিনি আলী (রাঃ) এর পরিবারের ভাগে পড়েছেন। এমতাবস্থায় আলী (রাঃ) তাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করেন।

এদিকে সৈন্যদের মধ্যে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা দেখলেন যে, আলী (রাঃ) তাবু থেকে গোসল করে বের হয়েছেন, তাঁর মাথা তোয়ালে দিয়ে পেঁচানো, মাথা থেকে পানির ফোঁটা বেয়ে বেয়ে পড়ছিল। এ বিষয়টি কিছু সৈন্যের নিকট খটকা লেগেছে, তাঁদের মনে হয়েছে হয়তো মালে গানীমাত ভাগ করার সময় আলী (রাঃ) নিজের অংশ নির্ধারণে নিজেকে কিছুটা প্রাধান্য দিয়েছেন (এ কারণেই সম্ভবত এই নারী বন্দিটি তাঁর অংশে পড়েছে!)।

বুরায়দাহ বিন হুসাইব আল আসলামী (রাঃ) -যার নিজের মনেও কিছুটা খটকা লেগেছিলো আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে- তিনি খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে বললেন –যিনিও অবস্থাদৃষ্টে মনে মনে কিছুটা দ্বিধায় ভুগছিলেন- আপনি কি দেখেছেন আলী এটা কি করলেন?! তখন খালিদ (রাঃ) আলী (রাঃ) কে বললেনঃ হে আবুল হাসান, কি ব্যাপার? এটা কী করলেন? তখন আলী (রাঃ) বললেন, আপনি যে মেয়েটির কথা বলছেন সে একজন যুদ্ধবন্দি ছিলো, নিয়মানুযায়ী বন্টন করার পর সে খুমুসের এক পঞ্চমাংশের মধ্যে পড়েছে, অতপর উক্ত সম্পদ ভাগ করলে সে রাসূল (সাঃ) এর বংশের অংশের মধ্যে পড়েছে, পরবর্তী বন্টনে সে আমার পরিবারের অংশে পড়েছে। অতপর আমি তার সাথে মিলিত হয়েছি (অর্থাৎ এখানে নিয়ম বহির্ভূত কিছুই করিনি আমি)।

খালিদ (রাঃ) আলী (রাঃ) এর এ ব্যপারটি নিয়ে রাসূল (সাঃ) কে একটি পত্র লিখলেন, বুরায়দাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন যে, আমাকে আপনার চিঠির সত্যায়নকারী হিসেবে পাঠান। অতএব খালিদ (রাঃ) তাঁকে চিঠিসহ পাঠালেন।

বুরায়দাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর নিকট এসে আলী (রাঃ) এর কথা কিছুটা নেতিবাচক ভাবে জানালাম। বললাম আলী (রাঃ) এক খুমুস থেকে দাসী নিয়েছেন। এবং তাঁকে চিঠি পড়ে শুনাচ্ছিলাম এবং মাথা নাড়তে নাড়তে বলছিলাম যেঃ হ্যাঁ,খালিদ ঠিকই বলেছেন, -আমি ছিলাম এমন লোক যে কথা বলার সময় মাথা নিচের দিকে করে কথা বলে যায়, মাথা উঁচু করে আশেপাশে তাকায়না-, চিঠি শেষ করে যখন আমি মাথা উচু করে রাসূল (সাঃ) এর দিকে তাকালাম, আমি দেখতে

পেলাম যে, তাঁর চেহারা মুবারাক পরিবর্তিত হয়ে লাল রঙে রূপ নিয়েছে। তিনি আমার হাত ও চিঠি ধরে বললেন,বুরায়দাহ! তুমি কি আলী কে অপছন্দ করো? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। রাসূল (সাঃ)বললেনঃ ‘‘তাঁকে অপছন্দ করো না। তাকে ভালোবেসে থাকলে আরও বেশী করে ভালোবাসো। কারণ আমি যার প্রিয়ভাজন আলীও তার প্রিয়ভাজন। খুমুসের অংশের মাঝে আলী এবং তার পরিবারের অধিকার একজন বাঁদির চাইতেও উত্তম এবং বেশী।

বুরায়দা (রাঃ)বলেন, রাসূল (সাঃ) এর এ কথার পর আলী (রাঃ) এর চেয়ে বেশী প্রিয় মানুষ আমার কাছে আর কেউ ছিল না।

বুরায়দা ও খালিদ (রাঃ) এর মনে যা ছিল সম্ভবত সেগুলো সেনাবাহিনীর অন্যদের মধ্যেও প্রশ্নের উদ্রেক ঘটিয়েছিল। আর খালিদ (রাঃ) চিঠি লিখে যা জানিয়েছিলেন সেগুলোই মূলতঃ অন্যরা আলাপ আলোচনা করছিলেন।

একই সময়ে উপরোক্ত ঘটনার সাথে অন্য আরেকটি ঘটনাও যোগ হয়েছে। যুদ্ধ বিজয়ের পর আলী (রাঃ) এর সৈন্যরা দেখলেন যে, তাঁদের উটগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছে, সেজন্য তাঁরা আলী (রাঃ) এর কাছে আবেদন জানালেন যে তাঁদের নিজেদের উটসমূহকে বিশ্রামে রেখে সাদাকার উটগুলোকে যেন ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। আলী (রাঃ) তাঁদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে, এতে তোমাদের যেমন হক রয়েছে তেমনি অন্য মুসলিমদেরও অধিকার রয়েছে (তাই এই উট ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দেয়া যাবেনা)। সম্ভবত এ বিষয়টিও কারো কারো মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

এদিকে রাসূল (সাঃ) মদীনা থেকে মক্কায় গেলেন বিদায় হজ্জ্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে ইয়ামানে আলী (রাঃ) এর কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিলো, এবং তিনি ফিরতি পথে ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসুল (সাঃ) এর সাথে হজ্জ্বে শরীক হওয়া এবং হজ্জ্ব উপলক্ষে কোরবানীর জন্য রাসুল (সাঃ) এর অবশিষ্ট পশুগুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি কিছুটা তাড়াহুড়া করছিলেন। সে জন্য বাহিনীর মধ্যে থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে তিনি আগে আগে দ্রুত মক্কার দিকে রওয়ানা করলেন, এবং রাসূল (সাঃ) এর ইহরামের মত করে তিনিও হজ্জ্বের ইহরাম বাঁধলেন, এই বলে যেঃ হে আল্লাহ! আমি হজ্জ্বের জন্য সেভাবেই নিয়্যাত করে ইহরাম বাঁধলাম যেভাবে আপনার রাসূল (সাঃ) ইহরাম বেঁধেছেন।

অবশেষে তিনি যখন মক্কায় পোঁছালেন ততক্ষণে রাসূল (সাঃ) তাওয়াফ ও সা'য়ী শেষ করে ফেলেছেন, এবং আল-আবতাহে (মক্কা ও মিনার মাঝে ঢালু অঞ্চল) অবস্থান নিয়েছেন। এবং তাঁর যেসব সাথীরা কুরবানির পশু আনেননি তারা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন।
এমতাবস্থায় তিনি তদীয় স্ত্রী ফাতিমা (রাঃ) এর তাবুতে প্রবেশ করলেন। ফাতিমা (রাঃ) ততক্ষণে উমরাহর ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন, রঙিন পোশাক পরিধান করেছেন এবং সুরমা নিয়েছেন, নিজের অবস্থানের জায়গাকে আতর দিয়ে সুগন্ধিযুক্ত করেছেন। আলী (রাঃ) তাঁর অবস্থা এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, আব্বা আমাকে আদেশ দিয়েছেন সেজন্য করেছি।
আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর নিকট ছুটলেন বিষয়টির নিয়ে তাঁর কাছে নালিশ করার জন্য যেমনটি যুবক স্বামীরা করে থাকেন। তিনি রাসূল (সাঃ) কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! ফাতিমা এমন এমন কাজ করেছে এবং সে ভেবেছে যে আপনি তাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। আমিই তাকে নির্দেশ দিয়েছি এটা করার জন্য"। তারপর তিনি আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি হজ্জের জন্য কি নিয়্যাত করেছো? তিনি জবাবে বললেন যেঃ আমি বলেছি- হে আল্লাহ! তোমার রাসূল যে নিয়্যাত করে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সেই নিয়্যাত করে ইহরাম বাঁধলাম। যেহেতু তার সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তাই রাসুল (সাঃ) তাকে বললেন যে, তাহলে তুমি ইহরাম থেকে মুক্ত হবেনা এখন। অতঃপর আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর সাথে হজ্জ্ব আদায় করলেন।
অতপর কুরবানীর দিন রাসূল (সাঃ) কুরবানীর পশুসমূহ আনতে নির্দেশ দিলেন। রাসূল (সাঃ) যেসব পশু নিয়ে এসেছেন এবং আলী (রাঃ) যেগুলো ইয়েমেন থেকে নিয়ে এসেছেন সেগুলোর সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১০০ টি উট। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "আবুল হাসানকে ডাকো"। আলী (রাঃ) আসলেন এবং তাঁকে রাসূল (সাঃ) হিরবাহর (বর্শা) নিম্নভাগকে ধরতে বললেন, এবং তিনি অগ্রভাগ ধরলেন। এভাবে রাসূল (সাঃ) উটগুলোকে নহর (উট যবাই করার পদ্ধতি) করতে শুরু করলেন এবং

সেগুলো রীতিমত প্রতিযোগিতা করে রাসূল (সাঃ) এর সামনে আসতে থাকল কে কার আগে যাবে, এবং কাকে রাসুল (সাঃ) জাবাই করবেন!

রাসূল (সাঃ) তাঁর বয়সের সমপরিমাণে তেষট্টি টি উট নহর সম্পন্ন করে আলী (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন বাকীগুলোর নহর শেষ করতে। তিনি তাঁর কুরবানীর কাজে আলী (রাঃ) কে শরীক করলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যেন মানুষের মাঝে এর গোশত বিতরণ করে দেয়। নবীজী (সাঃ) তাঁকে বললেনঃ

أقسِم لحومَها و جِلالها و جُلودها بين الناس، و لا تُعطِ جَزّارا منها شيئا، نحن نعطيه مِن عندنا، وخُذْ من كل بعير حِذية من لحم، ثم اجعلها فى قِدر واحدة؛ حتى نأكل من لحمها و نحسُو من مَرقها.

অর্থাৎ- এগুলোর গোশত, পোশাক[5], চামড়া মানুষের মাঝে বিতরণ করে দাও। কসাইকে সেখান থেকে কিছু দিবেনা। আমরা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক দেব। আর প্রতিটি উট থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়ে একটা পাতিলে রাখো যেন আমরা সেখান থেকে খেতে পারি এবং এর ঝোলের স্বাদ আস্বাদন করতে পারি।

বস্তুত রাসূল (সাঃ) এর পৃষ্ঠদেশ থেকে আলী (রাঃ) এর হিরবাহ (বর্শা) ধরার ঘটনা দু'টি পবিত্র দেহের ঘনিষ্টতা যেমন প্রমাণ করে, তেমনি তা তাঁদের রুহ এবং অন্তরের নৈকট্যতা এবং সৌহার্দতারও বিবরণ দেয়।

ইহা হৃদ্যতার এমন এক দৃশ্য যা বন্ধু বান্ধব তো পরবর্তী স্তরের লোক, আপন সহোদরদের মাঝেও সাধারণত পাওয়া যায়না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এভাবে আলী (রাঃ) কে সম্মানিত করেছেন যেন তিনি ভালোবাসা এবং নৈকট্যতা উভয় দিক থেকেই রাসূল (সাঃ) এর সাথে যথাসম্ভব নিবিড় হতে পারেন।

এমনও হতে পারে যে রাসূল (সাঃ) এর পশ্চাতদেশ থেকে হিরবাহ (বর্শা) ধরে রাখা এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাঁর নিজ বয়সের সমপরিমাণ পশু কুরবানী করার মাঝে রাসূল (সাঃ) এর সাথে আলী (রাঃ) এর কাটানো জীবনের একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যে রাসূল (সাঃ) রিসালাতের কাজে সময় অতিবাহিত করেছেন, এবং আলী (রাঃ) তাঁকে ঘিরে রেখেছেন, ও সামনের দিকে পথ চলায় তাঁকে সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁকে নিজের আয়ুর সমপরিমান উট কুরবানীর কাজেও অংশীদার করে নিয়েছেন, যেমনটা

(5) "জিলাল" শব্দ দ্বারা উটের পিঠ ও শরীরে থাকা হাওদা, গদি ইত্যাদি সকল পোশাক-আশাক বুঝানো হয়।

নিজের জীবনের মিশন আদায় করার সময় দাওয়াত ও জিহাদের কাজেও শরীক করে নিয়েছিলেন।

প্রিয় পাঠক! রাসুল (সাঃ) কুরবানীর কাজে কিভাবে আলী (রাঃ) কে অন্তর্ভূক্ত করেছেন এই দৃশ্যটি আবার একটু ভাবুন! সম্পর্কের ঘনিষ্টতা থাকা স্বত্বেও তিনি স্বীয় কন্যা ফাতিমা কিংবা তাঁর স্ত্রীদেরকেও এই কাজে সাথে নেননি। শরীক করেননি তাঁর অন্য কোন সাহাবীকেও, রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম আজমা'ঈন।

রাসূল (সাঃ) এবং আলী (রাঃ) এর মধ্যকার সম্পর্কের উচ্চতা পূর্ণতায় রূপ নেবে যখন আপনি তাঁদেরকে একটি পাত্রের সম্মুখে বসে থাকাকে কল্পনা করবেন। যে পাত্রতে রয়েছে তাঁদের সদ্য কুরবানী কৃত পশুর গোশত। তাঁরা সেখান থেকে গোশত খাচ্ছেন এবং এর ঝোলে চুমুক দিচ্ছেন। এটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বা খাবারের সাধারণ কোন দস্তরখানের বৈঠক নয়। তাঁরা তাঁদের সেই কুরবানীর পশুর গোশত থেকে আহার করছেন যেগুলোকে তাঁরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য জবেহ করেছেন। সদ্যই তাঁরা সুমহান একটি ইবাদত সম্পন্ন করেছেন, সুমহান এক স্থানে অবস্থান করে, এবং সুমহান এক দিনে। হজ্বের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার খুশিতে অন্তরে আনন্দের জোয়ার বইছে। তাঁরা উভয়েই সে আনন্দকে উদযাপন করছেন মহব্বতের অনুভূতি নিয়ে, এবং ভালোবাসাকে ধারণ করছেন আনন্দের উপলব্ধি দিয়ে!

ইয়া রাব্বাহ! হৃদ্যতা ও ভালোবাসার যুগপৎ গভীর এই দৃশ্যটিকে কিভাবে কল্পনা করবো? প্রভুর কসম; আমি এই দৃশ্যের কল্পনায় নিজেকে সেই সময়ে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমি সেখানে এবং সেই স্থানে দাঁড়িয়ে নিজ চোখে কল্পনাটিকে বাস্তবে দেখছি। এই সহজীয়া দৃশ্যটির মাঝে কত গভীর প্রভাব অন্তর্নিহিত থাকতে পারে সেটি ভেবেই আমি শিহরিত হচ্ছি। আবেগের ফল্গুধারায় সিক্ত হচ্ছে আমার অন্তর যা বর্ণনা করার নিস্ফল প্রচেষ্টা আমি করবোনা।

কিন্তু প্রিয় পাঠক! আপনিও সে দৃশ্যকে কল্পনা করুন। ভাবুন যে আপনি তা দেখছেন, তাহলে আপনিও সে অনুভূতির কিছুটা স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন এবং তৎকালীন পরিস্থিতিকে একটু হলেও উপলব্ধি করতে পারবেন।

আপনি এই অনুপম দৃশ্য দেখে বলতে বাধ্য হবেন যে, আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর নিকট কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর এটি ছিল আলী

(রাঃ) এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর ঐ কথারই বাস্তবায়ন যেঃ “তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে”।

আল্লাহ তা’আলার দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

এবার আসুন! আমরা ফিরে যাই আলী (রাঃ) এর সেনাদের দিকে যারা তাঁর পেছনে রয়ে গিয়েছিলো, এবং মক্কার দিকে এগিয়ে আসছিলো। বাহ্যত মনে হচ্ছিলো আলী (রাঃ) যাকে আমীর বানিয়ে রেখে এসেছিলেন তিনি ব্যক্তি হিসেবে কিছুটা নম্র প্রকৃতির ছিলেন। সৈন্যরা তাঁদের দাবীগুলো তাঁর নিকট সহজেই আদায় করে নিতো, তাই আলী (রাঃ) ইতিপূর্বে যা নিষেধ করেছিলেন তাঁদের নিজেদের উট বিশ্রামে রেখে সাদাক্বার উট ব্যবহারের ব্যাপারে সেটির অনুমোদন তাঁরা তার থেকে পেয়ে গেলো এবং তাঁরা সাদাক্বার উট ব্যবহার করা শুরু করে দিলেন। এছাড়াও তাঁদেরকে তিনি দামী কাতান কাপড় যেগুলো আলী (রাঃ) এর সাথে ছিলো সেগুলো দিয়ে সজ্জিত করে দিলেন।

এদিকে আলী (রাঃ) যখন হজ্জ্ব সমাপ্ত করলেন তখন রাসূল (সাঃ) তাকে বললেনঃ

اخرج إلى اصحابك حتى تقدم عليهم

অর্থাৎ- তোমার সাথীদের কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হও যেন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসতে পারো।

আলী (রাঃ) তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হলেন এবং তাঁদেরকে অলংকারসদৃশ দামী পোশাকে সজ্জিত দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁর সহকারীকে বললেনঃ আফসোস! এটা কী? তিনি জবাব দিলেনঃ আমি তাঁদেরকে একটু ভালো পোষাক পরিয়েছি যাতে তাঁরা মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় কিছুটা পরিশীলিত থাকতে পারে। তিনি বললেন, ধিক্কার! রাসূল (সাঃ) এর সাথে দেখা হওয়ার আগেই এগুলো দ্রুত খুলে নেও তাদের থেকে। অতঃএব তাঁর সহকারী পোশাকগুলো খুলে নিয়ে ফেরত দিলেন।

এরপর আলী (রাঃ) যখন সাদাক্বাহর উটের মধ্যে ত্রুটি এবং ক্লান্তির নিদর্শন দেখলেন, তাঁর বুঝতে বাকী রইলোনা যে এসব উটে আরোহন করা হয়েছে এবং সেগুলোতে আসনের চিহ্নও রয়ে গেছে এখনো। এই সব কিছু পরিদর্শন করে তিনি তাঁর নিয়োগ করা আমীরকে তিরস্কার করলেন।

লোকেরা আলী (রাঃ) এর এ আচরণকে কঠোরতা ও অতিরিক্ত শাসন হিসেবে নিলো। তাঁদের মাঝে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিলেন রাসূল (সাঃ) কে এগুলো সব বিস্তারিত জানাবেন। এবং আলী (রাঃ) তাঁদের উপর কঠোরতা করছেন এমন ধারণাবশত হয়ে তাঁরা রাসুল (সাঃ) এর কাছে অভিযোগ করলেন।

হয়ত সৈন্যদের নালিশের কারণ ছিল প্রদত্ত জিনিসের প্রতি তাঁদের মনের টান সৃষ্টি হওয়ার পর সেগুলোকে আবার তাঁদের কাছ থেকে খুলে নেয়া হয়েছে। এতে তাঁরা মনে কষ্ট পেয়েছেন, সেই সূত্রে তাঁদের এই অভিযোগ।

এছাড়াও পূর্ববর্তী অভিযোগ শুধুমাত্র বুরায়দা ও খালিদ (রাঃ) এর পক্ষ থেকে ছিলনা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকেও ঘটনার এমন বর্ণনা পাওয়া যায় (১৫)। সব কিছু মিলে দেখা যাচ্ছে যে এ দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এটা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কানাঘুষাও হচ্ছিলো।

এই নেতিবাচক মনোভাব ছড়ানোর নেপথ্য কারণ সম্ভবত এই ছিলো যে, এই সৈন্যদের অধিকাংশ লোকই ছিলেন নও মুসলিম। তাঁরা জিহাদ ও গনীমাতের মালামালের বিধি বিধানের ব্যাপারে সেভাবে জানতেননা যেভাবে আলী (রাঃ) এগুলো জানতেন। এজন্য রাসূল (সাঃ) এটার সুরাহা করলেন একটি সাধারণ বক্তব্যের মাধ্যমে যা চলমান ক্ষোভকে প্রশমিত করলো। রাসুল (সাঃ) আলী (রাঃ) এর উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করলেন, এবং তাঁর অবদানের স্বীকৃতি দিলেন। যার অর্থ যিনি মর্যাদা, সম্মান ও জ্ঞানের এত উচ্চ স্তরে আছে তাঁর আপাত কোন কাজ দেখেই তাঁকে অপবাদ কিংবা বা দোষারোপ করা উচিৎ নয়, বরং এর অন্তঃর্নিহিত উদ্দেশ্য খোঁজা উচিৎ।

বস্তুত আমরা আলী (রাঃ) এর কাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, তিনি উপর্যুক্ত সবগুলো ব্যাপারেই সঠিক ছিলেনঃ

প্রথমত যে দাসীর সাথে তিনি একান্ত হয়েছেন তাকে তিনি গনীমতের মালামাল বন্টন হওয়ার পূর্বে হস্তগত করেননি, এবং অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারও হরণ করেননি যে সে অন্য কারো অংশে ছিল অতপর তিনি তাকে স্বীয় প্রভাব খাটিয়ে নিয়ে নিয়েছেন। বরং তিনি গনীমতের মালামালকে নিয়মানুযায়ী পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন এবং সে নারী পড়েছে খুমুসের অংশে। অতঃপর খুমুসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করার পর সে রাসূল (সাঃ) এর বংশের ভাগে পড়েছে। অতঃপর এই অংশকে পাঁচ ভাগে বন্টন

করার পর সে আলী (রাঃ) এর পরিবারের ভাগে পড়েছে। এরপর তিনি তাঁর নিজের অংশ থেকে তাকে ব্যবহার করেছেন। এজন্যই রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

والذي نفس محمد بيده؛ لَنصيب علي في الخُمُس أكثر من ذلك، لَنصيب علي أكثر من وصيفة.

অর্থাৎ- "সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রাণ; এক পঞ্চমাংশের মধ্যে আলী'র অধিকার এর চেয়েও বেশী। আলী'র প্রাপ্য অংশ একজন দাসী থেকে আরও বেশী"। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে তিরস্কার করা কিংবা নিন্দার কোন অবকাশ নেই।

এদিকে কাতানের যে মূল্যবান পোশাকগুলো সেনাবাহিনী ব্যবহার করে ফেলেছে এবং তা তাঁদের থেকে ফেরত নেয়া হয়েছে সেগুলো সৈন্যদের মাঝে তখনও বিতরণ করার জন্য ছিলোনা, আর সফরে ব্যবহারের মাধ্যমে তা পুরনো জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। এবং আলী (রাঃ) যেহেতু রাসূল (সাঃ) এর সাথে প্রথম যুদ্ধ থেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাই তিনি গনীমাতের মালের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি অবণ্টিত গনিমতের মাল ব্যবহারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। সেজন্যই তিনি সেগুলোকে দ্রুত খুলে নিয়েছেন। কারণ তারা যেগুলো পরিধান করেছেন সেগুলো তাঁদেরকে তখনো বিতরণ করা হয়নি এবং সেগুলোতে অন্য মুসলিমদের হক্ব রয়ে গিয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে সাদাকার উটে আরোহন করা অথবা বোঝা বহন করিয়ে সেগুলোকে ক্লান্ত করতে না চাওয়ার কারণ ছিলো যেহেতু তাতে এতিম মিসকীন ও অন্যান্যদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং আলী (রাঃ) আমীর হিসেবে এদের মাঝে দূরে থাকা ব্যক্তিবর্গ এবং এতিম, গরীবদের সম্পদকেও দেখাশোনা করার দায়িত্বে ছিলেন। তেমনি ভাবে সৈন্যদেরও উচিত ছিল নিজেদের উটকে বিশ্রাম দিয়ে সাদাকার উটকে ব্যবহার করার মত সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকা। এজন্যই আলী (রাঃ)বলেছেনঃ "তাতে তোমাদের যেমন অংশ রয়েছে, অন্য মুসলিমদেরও তেমনি অংশ রয়েছে"। এবং এটি যেহেতু শুধুমাত্র তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং অন্য হকদার মুমিনদেরও অংশ রয়েছে এগুলোতে যার সীমা অতিক্রম করা বৈধ হবে না; তাই এগুলোকে কাজে ব্যবহার করে দূর্বল ও ক্লান্ত বানিয়ে এর হকদারদের কাছে বিতরণ করা জায়েয হবেনা।

আল্লাহ তা'আলা আবুল হাসান (আলী) এর উপর সন্তুষ্ট হোন। তিনি এ সকল কাপড় নিজের ভাগে রেখে দিয়ে ভোগ বিলাস করা, কিংবা সেগুলো দিয়ে ব্যবসা করার জন্য

তা ফেরত নেননি। বরং এই জন্য নিয়েছেন যে, তাতে অন্য লোকদের অংশ রয়েছে যারা এগুলোর আরও বেশী হকদার এবং আরও বেশী মুখাপেক্ষী। আর এটা মনে করারও কোন অবকাশ নেই যে, তিনি সাদাক্বার উটকে বিশ্রাম দিতে চেয়েছেন এগুলোতে তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন কিংবা অধিকার ছিল এই ইচ্ছেয়। বরং, বাস্তবতা তো হলো যে সাদাক্বার সম্পদ ব্যবহার করা যাদের জন্য হারাম তিনিও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন (নবী পরিবারের সদস্য হওয়ায়), তাই সেগুলো তিনি নেয়ার কোন কারণ নেই।

বস্তুত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে কোন কোন সম্মানীত সাহাবীর মনক্ষুন্ন হওয়ার বিষয়টি ছিল অনেকটা রাসূল (সাঃ) এর হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের সম্পদ বণ্টন করা নিয়ে আনসারদের কারো কারো মনক্ষুন্ন হওয়ার ঘটনার মত। হুনাইনের যুদ্ধে যখন রাসূল (সাঃ) এক পঞ্চমাংশ থেকে মু'আল্লাফাতুল ক্বুলুবদেরকে[6] শত শত উট দিয়ে দিয়েছিলেন এবং আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না, তখন তাঁদের মনে একটু কষ্টের ছায়া পড়েছিলো। সেজন্য রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে একত্রিত করে বললেন যে, অনেক নওমুসলিম যাদের অন্তরে ঈমান এখনো শক্তিশালী নয় তিনি তাঁদের প্রতি বাহ্যত কিছুটা সদয় আচরণ করছেন। আনসারদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা যে কল্যান দিয়েছেন তাঁদের জন্য সেটিই যথেষ্ঠ। এ কথা শুনে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের অন্তর প্রসন্ন হয়ে গেলো (১৬)।

রাসূল (সাঃ) মু'আল্লাফাতুল ক্বুলুবদেরকে দিলেন কিন্তু, তাঁর আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন, অথবা তাঁর সাথে পূর্ব থেকেই থাকা সাহাবিদেরকেও কিছু দিলেন না, নিজের জন্যও কিছু রাখেননি।[7]

আল্লাহ তা'আলা আলী (রাঃ) এর উপর রহম করুন। তিনি তার পুরো জীবন আরাম আয়েশ থেকে দূরে থেকে অতিবাহিত করেছেন। অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে গেছেন। তাঁর একমাত্র আগ্রহ ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছে রক্ষিত সেই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি।

---

(6) অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় বা অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর নওমুসলিম যাদের মনে এখনো ইসলাম পরিপূর্ণরূপে জায়গা করে নেয়নি, তাদেরকে আপতকালিন কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া সাময়িক মনোরঞ্জনের জন্য।
(7) এর পরও যেমন হুনাইনের যুদ্ধে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির অবতারণা হয়েছিলো, আলী (রাঃ) এর ক্ষেত্রেও কিছুটা এমনি হয়েছে।

জীবন ধারণের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা রাসূল (সাঃ) এর মতো জীবনের যাপন করতেন। তাঁর বাড়ী ছিলো রাসূল (সাঃ) এর বাড়ীর মতো। কাছাকাছি দেয়াল। মাথা লাগোয়া ছাদ। অর্থ সম্পদ ছিলো কম। বাড়ীতে কোন সেবক ছিল না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন জান্নাতের রমণীদের সর্দার যিনি নিজ হস্তেই আটা পিষতেন ফলে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত[৪]। তদীয় বাড়ী নিজেই পরিস্কার করতেন ফলে তাঁর পোশাক ময়লা হয়ে যেত। চুলোয় রুটি তৈরী করতে করতে চেহারায় ছাপ পড়ে যেত। দূর থেকে কাঁধে করে পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে আসার কারণে কাঁধে দাগ হয়ে গিয়েছিলো!

রাসূল (সাঃ) তাঁদের সকল অবস্থা জানতেন তবুও তাঁদেরকে সম্পদ দেয়ার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় কোন অগ্রাধিকার দেননি। তাঁদের জন্য আলাদা করে কোন সম্পদ নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং তিনি তাঁদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে আখিরাতের স্থায়ী প্রাপ্তিকে প্রাধান্য দিতে উদ্ধুদ্ধ করেছেন।

দেখুন! নবী তনয়া, জান্নাতের নারীদের সর্দার, আলী পত্নী ফাতিমা (রাঃ) আয়িশা (রাঃ) এর ঘরে তাঁর পিতা রাসূল (সাঃ) এর কাছে যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে একজনকে সেবক হিসেবে দেয়ার জন্য অনুরোধের আশা নিয়ে এসেছেন যেন তাঁর কষ্ট একটু লাঘব হয়। তিনি সেখানে গিয়ে রাসূল (সাঃ) কে পাননি। ফাতিমা ও আয়িশা (রাঃ) এর মাঝে হৃদ্যতা, ভালোবাসা এবং খোলা মনের সম্পর্ক থাকায় তিনি নিজের আসার কারণ জানিয়ে বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

রাত্রিবেলা রাসূল (সাঃ) বাড়ীতে আসলে আয়িশা (রাঃ) তাঁকে ফাতিমা (রাঃ) এর আসার কারণ এবং প্রয়োজনের কথা জানালেন। রাসূল (সাঃ) কাল বিলম্ব না করে দ্রুত ফাতিমা (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে তাঁর স্বামীর বাড়ীতে এলেন। তিনি যখন তাঁদের কাছে আগমন করলেন যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। আলী (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেন যেঃ আমাদের গায়ের উপরে এমন একটি লেপ ছিল যা দিয়ে শরীর লম্বালম্বি ঢাকতে গেলে আমাদের একপাশ আলগা হয়ে যেত এবং আড়াআড়ি ঢাকতে গেলে আমাদের মাথা ও পদযুগল দেখা যেত। এই জন্য আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু রাসূল (সাঃ) বললেন:

---

(৪) مجلت اليد বলা হয় যখন শক্ত জিনিস নিয়ে কাজ করতে করতে হাতের মধ্যভাগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়, এবং গিঁটে বা কড়ার মতো ফুলে থাকে। দেখুন:আন নিহায়াহ ৪/৩০০ এবং হাশিয়াতুস সিন্দী আলা মুসনাদি আহমাদ ১/৪১৪]।

“তোমরা যেভাবে আছো সেভাবেই থাকো”। অতঃপর তিনি তাদের দু’জন শায়িত অবস্থাতেই তাঁদের মাঝামাঝি বসলেন। আলী (রাঃ) বলেনঃ এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করলাম। অতপর তিনি আমাদেরকে বললেন যেঃ “তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছো তার চেয়ে আরও ভালো কিছু কি আমি তোমাদেরকে বলে দেব না”? আমরা বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেনঃ “তোমরা যখন ঘুমানোর প্রস্তুতি নিবে তখন তোমরা তেত্রিশ (৩৩) বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে। এটা তোমাদের জন্য সেবক বা খাদিমের চেয়ে উত্তম। আল্লাহর কসম! আহলে সুফফাদের[9] পেট ক্ষুধার জ্বালায় বাঁকা হয়ে আছে এরকম অবস্থায় আমি তোমরা যা চেয়েছিলে তা তোমাদেরকে দিতে পারবোনা। আমি দরিদ্র এই সব মুসলিমদের ভরণ-পোষণে ব্যয় করার মতো কিছু পাচ্ছিনা, তাই বন্দীদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমি এদের জন্য ব্যয় করবো (১৭)।

নববী এই শিক্ষায় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন আলী ও ফাতিমা আলাইহিমাস সালাম।

নববী এই পরিচর্যায় তারবিয়্যাত প্রাপ্ত হয়েছেন আলী ও ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুমা।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তা’আলা তাঁর নবী (সাঃ) এর সামনে অবারিত সুযোগ দান করেছেন এবং তিনি শত শত উটকে মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেখান থেকেও তিনি আলী (রাঃ) এর জন্য কোন ভাগ বরাদ্দ করেননি, তাঁকে অগ্রাধিকার দেননি এবং তাঁর জন্য কোন অংশ নির্ধারণও করেননি।

তিনি ঝুলি ভরে ভরে সম্পদ মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছেন কিন্তু আলী (রাঃ) কে সেগুলো থেকে কিছু প্রদান করেননি। কোন কোন সাহাবীকে তিনি বিভিন্ন পরিমাণ জমিন এবং সম্পদ ভাগ করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি আলী (রাঃ) এর জন্য এক লাঠি পরিমাণ জায়গাও আলাদা করে বরাদ্দ করেননি।

---

(9) আহলে সুফফা হলেন সে সকল দরিদ্র মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম যাঁদের পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ী ছিলোনা, তাঁরা মসজিদে নববীতে থেকেই দিন অতিবাহিত করতেন, নবীজী (সাঃ) এর সান্নিধ্যে থেকে ইলম অন্বেষণ, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর মতো করেই কৃচ্ছতার জীবনযাপন করেছেন। তার বাসস্থানও ছিল রাসূল (সাঃ) এর বাসস্থানের মতই খুবই সাধারণ। তার জীবনটাও ছিল রাসূল (সাঃ) এর মত অতি সাধারণ জীবন।

এবং রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরও আলী (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর সময়কালের মতই সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। যদিও পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে অনেক স্বচ্ছলতা দিয়েছেন এবং পৃথিবীর দিগ্বিদিক বিজিত হয়েছিল। যখন পৃথিবীতে কল্যাণ অবারিত হল এবং মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটলো তারা সেগুলোকে ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু আলী (রাঃ) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি আগের অবস্থায়ই রয়ে গেলেন তাকে যে অবস্থায় রেখে রাসূল (সাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর যখন তাঁর অধীনে ছিলো সকল সম্পদ তখনও তিনি মুসলিমদেরকে দুনিয়ার উন্নত জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত করেননি, অথবা তাদের সম্পদে অযাচিত হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সর্বদাই তিনি ছিলেন কঠোর, ধন-সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে তাঁর থেকে সতর্কতা ও অনুসন্ধান বৈ ঢালাও কোন আয় বর্ণিত হয়নি (১৮)।

যখনই কুফার বায়তুল মালে সম্পদ একত্রিত হত তিনি মানুষকে ডেকে সেগুলো তাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। এমনকি বছরে তিন (৩) বার করেও মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন।

এভাবেই একদা ইস্পাহান অঞ্চলের খারাজ[10] কুফায় আসলে তিনি জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং বললেন, হে জনসমাজ! সবাই চতুর্থ বরাদ্দের জন্য আসুন। আল্লাহর কসম! আমি এগুলোকে কোষাগারে জমা করে রাখবোনা। অতপর তিনি সেগুলোকে তাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। এবং বায়তুল মালের আঙিনা পরিস্কার করে সেখানে পানি ছিটিয়ে দিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর বললেনঃ ”হে দুনিয়া! তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করো”।

---

(10) খারাজ বলা হয় মুসলিম অঞ্চল সমূহের নির্দিষ্ট প্রকারের ভূমিতে উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন ফসলের উপর (শর্ত ও ধরণ প্রযোজ্য) বার্ষিক হারে ধার্যকৃত সম্পদের একটি ট্যাক্স বিশেষ যা বায়তুল মালে যোগ হয় জনসাধারণ ও দেশের কল্যানে ব্যয় করার জন্য।

তিনি দুনিয়ার ব্যাপারে অন্য সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন এবং এ বিষয়েই তিনি সবচেয়ে বেশী কৃচ্ছতা সাধণ করেছেন। আর এজন্যই তিনি দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলতেনঃ আমার দিকে তুমি মনোযোগী হচ্ছো, আমাকে ধোঁকায় ফেলতে চাও? আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ব্যাপারে সে চেষ্টা করো। আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি)। বস্তুত তোমার সময় খুবই স্বল্প, তোমার মজলিস তুচ্ছ এবং তোমার মূল্য একেবারেই কম (১৯)।
সায়্যিদুনা আলী (রাঃ) এর দুনিয়া বিমুখতা তা অর্জনের অক্ষমতা থেকে ছিলোনা, যে তিনি এসব নিয়ামত পাওয়ার পথ জানেন না অথবা সেগুলো হাসিলে অক্ষম এ জন্য তিনি কৃচ্ছতা সাধন করছেন। কক্ষনো নয়, বরং তার যুহদের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার উপরে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়া, এবং সম্পদে মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি এবং নিজের অধিকারকে বিলম্বিত করা।
আর এজন্যই তিনি বলেছেন-যেমনটি নাহজুল বালাগাতে এসেছেঃ “আমি চাইলে সহজেই এই পরিশোধিত মধুর ভান্ড আস্বাদন করতে পারি। ইচ্ছে করলেই মসৃন করে পেষা আটার স্বাদ নিতে পারি। অথবা পেলব কোমল রেশমী সুতোর কাপড় গায়ে জড়াতে পারি। কিন্তু, আমার মনের চাওয়া-পাওয়া আমার উপর বিজয়ী হবে, এবং সুস্বাদু খাবার-দাবার বা বিলাসী জীবনের যাপনের প্রতি আমার লোভ আমাকে আগ্রহী করে তুলবে এটি খুবই অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় একটি কাজ। হয়ত হিজাজ কিংবা ইয়ামামাতে এমন লোক আছে যার সামান্য কিছু পাওয়ারও কোন আশা নেই এবং পেট পূর্ণ করারও কোন নিশ্চয়তা নেই”(২০)।
সুবহানাল্লাহ! তাঁর এই বক্তব্য দেখুনঃ “হয়ত হিজাজ কিংবা ইয়ামামাতে এমন লোক আছে যার সামান্য কিছু পাওয়ারও কোন আশা নেই এবং পেট পূর্ণ করারও কোন নিশ্চয়তা নেই”। আর এর সাথে ফাতিমা (রাঃ) যখন একজন সেবকের আবেদন করেছিলেন তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে এবং ফাতিমা (রাঃ) কে যা বলেছিলেন তার সাথে ইহা তুলনা করে দেখুন। তিনি বলেছিলেনঃ ‘‘আল্লাহর কসম! আহলে সুফফাদের পেট ক্ষুধার জ্বালায় বাঁকা হয়ে আছে এরকম অবস্থায় আমি তোমরা যা চেয়েছিলে তা তোমাদেরকে দিতে পারবোনা’’। (২১)।
তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে কেমন শিখেছেন এবং কিভাবে তাঁর দেখানো পথে পথ চলেছেন!

এজন্য তার খিলাফতের বছরসমূহ কেটে গিয়েছিল এমন ভাবে যে তিনি অঢেল ধন-সম্পদ মানুষের মাঝে বিতরণ করেছেন। বায়তুল মালেও কোন কিছু জমা করে রাখেন নি, নিজের জন্য কোন অট্টালিকা তৈরী করেননি, ফসলি জমি কুক্ষিগত করে রাখেননি, অথবা সম্পদের পাহাড়ও তৈরি করেননি।
তাঁর নিকট আমীরুল মুমিনীন হিসেবে বায়তুল মাল থেকে নির্ধারিত সামান্য পারিশ্রমিক ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন মুসলিমদের নেতা ও আমিরুল মুমিনীন হাসান বিন আলী (রাঃ) ঘোষনা দিলেন তাঁর পিতার ধন সম্পদের হিসাব প্রকাশ করার। অতঃপর বললেনঃ "আলী (রাঃ) মাত্র ৭০০ দিরহাম ব্যতীত আর কোন দীনার কিংবা দিরহাম রেখে যাননি। এটি ছিলো তাঁর পারিশ্রমিকের অংশ, যা তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পরিবারের জন্য একজন সেবক ক্রয় করার আশায়" (২২)।
ইয়া আল্লাহ! তিনি তাঁর অংশ থেকে অর্থাৎ,বায়তুল মাল থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত যে বেতন ছিল সেখান থেকে এটুকু সম্পদ ধীরে ধীরে জড়ো করেছেন, অন্যথায় এতো স্বল্প পরিমাণ অর্থও তাঁর কাছে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হতোনা।
কেননা তাঁর খিলাফাতের বছরগুলোতে ছিল না কোন ক্ষমতার অহংকার কিংবা এর চাকচিক্য। না ছিলো কোন সম্পদের বিলাসিতা। বরং সময়টি ছিল-কষ্ট ও পরিশ্রমের। এমনকি আপনি মনে করতে পারেন এ বছরগুলো ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশী কষ্টের সময়। তিনি সে সময়টি অতিক্রম করেছেন বিভক্তি দূরীকরণ, ফিতনা প্রশমন এবং বিশৃঙ্খল অবস্থাকে শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে। তিনি এমন একটি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যাদেরকে তিনি রাসূল (সাঃ) এর সময়কালে পাননি।
তিনি ফিতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সীমালংঘনকারী ও খারেজীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর খিলাফাতকালটি ছিল উম্মাহকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শান্তি আনয়ন করার জন্য সংগ্রামমুখর একটি সময়। যা কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে একত্রিত করার সময়। এভাবেই জীবন কাটিয়েছেন ফজরের সালাতে যাওয়ার সময় ফিতনার তরবারী তাঁর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দেয়ার আগ পর্যন্ত।

আলী (রাঃ) ছিলেন সেসব মু'মিনদের মাঝে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত, এবং এই পথে কখনো বিচলতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি, এবং তাতে কোন পরিবর্তনও তাঁরা সাধন করেননি।

আলী (রাঃ) ছিলেন সেসব মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত যারা জীবনভর চেষ্টা ও মুজাহাদা চালিয়ে গিয়েছেন দ্বীনের তরে, এবং এভাবেই এক সময় আল্লাহ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়েছেন দুনিয়ার সম্পদ থেকে বে-নিয়াজ হয়ে। জাগতিক পারিশ্রমিকের জন্য তারা তাড়াহুড়া করেননি। কেননা তারা জানতেন যে তাঁরা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আখিরাতে সুমহান পুরস্কার পাবেন।

অতএব আমরা যখন আলী (রাঃ) কে ভালোবাসবো তখন আমরা এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসবো যাকে আল্লাহ তায়ালা তার আরশে আজীম থেকে ভালোবাসেন। এবং আমরা যখন আলী (রাঃ) কে মহব্বত করবো তখন আমরা এমন একজনকেই মহব্বত করবো যাকে রাসূল (সাঃ) ভালোবাসতেন এবং তাঁর ভালোবাসার ঘোষণাও দিতেন।

আমরা যখন আলী (রাঃ) কে ভালোবাসবো তখন আমরা এমন একজনকে ভালোবাসব যিনি রাসূল (সাঃ) থেকে এবং রাসূল (সাঃ) তার থেকে। কারণ, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে" (২৩)।

আর আমরা যখন আলী (রাঃ) কে ভালোবাসব এবং তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখব, তাকে আমাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো তখন আমরা বাস্তবে রাসূল (সাঃ) এর সাথেই বন্ধুত্ব করছি যিনি বলেছেনঃ "আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু"(২৪)।

আর আমরা যখন আলী (রাঃ) কে ভালোবাসবো তখন আমরা আশা করব যে, আমরা এর দ্বারা আমাদের ঈমানের দাবিকেই বাস্তবে রুপ দিচ্ছি। কেননা তাঁর ব্যাপারেই তো নবীজী বলেছেনঃ "মুমিন মাত্রই তাঁকে ভালোবাসবে এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁকে অপছন্দ করবেনা (২৫)।

আর আমরা যখন আলী (রাঃ) কে ভালোবাসবো তখন আমরা এমন একজনকে ভালোবাসবো রাসূল (সাঃ) যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, একজন জান্নাতী ব্যক্তি জমীনে চলাফেরা করছেন। তিনি বলেছেন-

وعلي فى الجنة

অর্থাৎ- ‘‘এবং আলী জান্নাতে’’ (২৬)।

অতএব, আমরা আশা করি যে আমরা তাঁকে ভালোবাসার কারণে জান্নাতে তার সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবো, কেননা বর্ণিত হয়েছে যেঃ ‘‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে’’ (২৭)।

❍ ❍ ❍

গাদীরে খুম্ম

স্থান ও সময়

সময়ের হিসেবেঃ রবিবার দিন। জিলহজ্জ্ব মাসের ১৮ তারিখ। ১০ম হিজরী, (১৬ মার্চ, ৬৩২ খৃষ্টাব্দ)। রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্জ্বের কাজ থেকে অবসর হলেন। মানুষকে বিদায় জানালেন। বললেনঃ "হয়ত এ বছরের পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না"(২৮)। লোকেরা প্রত্যেকেই যার যার গন্তব্যের পথে বিদায় নিলো, যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় এসেছেঃ "মীনা থেকে লোকেরা সবাই যার যার গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে গেলো" (২৯), তাঁদের বাড়ীঘর ও গোত্র অভিমূখে। রাসূল (সাঃ) এর সাথে থেকে গেলেন কেবল মদীনাবাসী এবং একই পথে বসবাসকারী অন্যান্যরা।

রাসূল (সাঃ) মক্কা থেকে ১৪ই জিলহজ্জ্ব, বুধবার খুব ভোরে বের হলেন এবং গাদীরে খুম্মে পৌঁছলেন রবিবার দিন, তথা মক্কা থেকে রওয়ানা দেয়ার চতুর্থ দিনে।

স্থানের হিসেবে সে জায়গার নাম ছিলঃ **গাদীরে খুম্ম**। মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান; মক্কা থেকে স্থানটির দূরত্ব ১৫৯ কিলোমিটার উত্তরে, মদীনা থেকে ১৯৬ কিলোমিটার দক্ষিণে, জুহফাহ নামক মীকাত থেকে ৬.৫ কিলোমিটার ও রাবিগ থেকে ১৮ কিলোমিটার পূর্বদিকে [11]। বর্তমানে স্থানটি "আল-গুরাবাহ" নামে পরিচিত (৩০)।

সে স্থানে মক্কা এবং মদীনার মধ্যে সফরকারী লোকদের মোটামুটি প্রায় অর্ধেক সফর শেষ হয়ে গিয়েছে। গাদীর মদীনাগামী কাফেলাদের গমনাগমণের পথে ছিল না। সেটি ছিল মক্কা - মদীনার পথ থেকে সামান্য পূর্বদিকে। সফরকারীরা সে পথটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। কারণ গাদীরে পানি একত্রিত হয় এবং সেখানকার ভূমি ছিল সহজ এবং প্রশস্ত। ঘন গাছপালাও ছিল যার নাম ছিল খুম্ম। সেজন্য গাদীরকে খুম্মের সাথে সম্পৃক্ত করে এই নামকরণ করা হয়েছে। বলা হতোঃ গাদীরে খুম্ম।

(11) দূরত্বের এই হিসেব সরল রেখায় এয়ার ডিস্টেন্স হিসেবে, ভূমিতে চলার পথের দূরত্বে নয়।

তাই পানির পর্যাপ্ততা, ছায়া নিবিড় অঞ্চল এবং প্রশস্ত ভুমি হওয়ার কারণে সফরকারীরা এখানে অবস্থান নিতেন।

হয়ত এ কারণেই রাসূল (সাঃ)ও তাঁর ভাষণের জন্য এ স্থানটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। প্রশস্ত জমিন এবং ঢালু হওয়ায় এখানে মানুষের একত্রিত হওয়া এবং রাসূল (সাঃ) এর কাছাকাছি বসাটা সহজতর হবে। এদিক থেকে এটি রাসূল (সাঃ) আরাফাতের দিন যেখানে ভাষণ দিয়েছিলেন সে "উরানা" উপত্যকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল (৩১)। সে উপত্যকাটিও ছিল খুবই প্রশস্ত এবং মানুষেরা সহজে সেখানে একত্রিত হতে এবং অবস্থান নিতে পারতেন।

আমি যখন এ বছর (১৪৩৭ হিজরী) গাদীর সফর করলাম সেখানে বেশ কিছু বয়োবৃদ্ধ এলাকাবাসীকে দেখলাম যারা গাদীরের আশেপাশে জুহফা উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানে বেড়ে উঠেছেন। সেখানকার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া এবং এর বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন মুছে যাওয়ার আগে গাদীরের অবস্থা তাঁরা কেমন পেয়েছেন সেটির বর্ণনা তাঁদের কাছ থেকে জানলাম।

তাঁরা জানালেন যে উপত্যকাতে একসময় বেশ কিছু প্রবাহমান ঝর্ণা, ঘন গাছপালা, জঙ্গল, ফসলীক্ষেত এবং খর্জুর বীথি ছিলো।

গাদীর বা কুপের অবস্থান ছিলো উপত্যকা লাগোয়াই। খুব বেশী প্রশস্ত কিংবা নদীর মতো চওড়া কিছু নয়, বরং এর বিভিন্ন পার্শ্ব ছিল খুবই কাছাকাছি। এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কয়েক মিটার করে। পাথর চিরে উদ্ভুত ঝর্ণা থেকে পানি নিঃসৃত হয়ে নিচে নেমে এসে সেখানে পতিত হতো, এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি সেখানে স্থির থাকতো। ক্রমাগত ঝর্ণার পানি নির্গত হলেও এর পানি বেশিও হতোনা আবার কমেও যেতোনা। কিন্তু বৃষ্টি হলে এবং উপত্যকার পানি ঢলে পড়লে তখন সেখান থেকেও পানি উপছে পড়তো এবং এর পরিধি তখন বেশ বড় হয়ে যেতো। মাঝে মাঝে তা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কয়েক দশক মিটার পর্যন্ত পৌছে যেত। পরবর্তীতে ঝর্ণার পানি শুকিয়ে গিয়ে গাদীরও শুকিয়ে গিয়েছে।

১৪০৬ হিজরী সালে উপত্যকায় বড় ধরনের একটি বন্যা হয়েছিলো যার প্রভাবে গাদীরের জায়গা ঢেকে যায় অনেকটা এবং পরবর্তীতে সেভাবেই থেকে যায়। যদিও তখনও সেখানে রয়ে যাওয়া সামান্য কিছু চিহ্ন থেকে অতীতের অবস্থা এবং স্থানটিতে ঘটে যাওয়া সেই মহান ঘটনার কিছু আঁচ পাওয়া যেতো। কিন্তু বর্তমানে

এর উপর মাটি ভরাট করে এখানে ব্রিজ তৈরী করা হয়েছে, উপর দিয়ে চলে গেছে রেললাইন।

তাই দুঃখজনক হলেও সেই স্মৃতি বিজড়িত স্থানের আর কোন চিহ্ন এখন অবশিষ্ট নেই। ব্রীজের কোনে ছোট্ট একটুকরো গর্তের মতো অংশ ছাড়া সেই জায়গারও এখন আর কোন নিশানা বাকী নেই। যেখানে কোন পথচারী হয়তো স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে লিখে রেখেছে “গাদীরু খুম্ম”। অথচ লেখা উচিত ছিলোঃ এখানে ছিল একদা “গাদীরু খুম্ম”!

স্থানের স্মৃতি

ঘটনাস্থল যদি কোন স্মৃতিচারণ করতে সক্ষম হতো তাহলে সে কি স্মরণ করতো? জমিন যদি তার কোন সংবাদ দিতে সমর্থ হতো তাহলে সে কি বলতো? গাদীরে খুম্মের চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার কিন্তু মনে হয়েছিলো যে, এই পাহাড় সারির পাথররাজী, তরু-লতার ডাল-পালা, এবং বিশাল খোলা ময়দানে লুকিয়ে আছে প্রাণের স্পন্দন। সালাফের রেখে যাওয়া পদধ্বনি এখনো যেন আন্দোলিত হচ্ছে। তাঁদের কথাবার্তার প্রতিধ্বনি ঝংকার তুলছে ইথারে, আমার কর্ণবিবরে।

আমি গাদীর এলাকা ভ্রমণ করেছি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে। এমন একটি সময় যখন রাসূল (সাঃ)ও এখানে ভাষণ দিয়েছিলেন। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে আশেপাশে বিচরণ করলাম। অনুভব করছিলাম আমার কল্পনারা সময়ের পর্দাকে বেধ করে চলে গিয়েছে দূর অতীতে, ফলশ্রুতিতে আমি সে মাটিতে চলছি আর স্বগতোক্তি করছিঃ হয়তো এখানেই আমার পদদ্বয় অন্য কোন পদচিহ্নের উপরে পতিত হচ্ছে। বস্তুত এমনি একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে ইবনু উমর (রাঃ) থেকে, তিনি বলেছিলেনঃ "হয়ত মোজা অন্য কোন মোজার উপর পতিত হচ্ছে" (৩২)।

এখানেই কি রাসূল (সাঃ) ছিলেন? এখানেই কি তার চরণযুগল পদচারনা করেছে? এখানের বাতাসই কি নবীজীর নিঃশ্বাস মোবারকে সিক্ত হয়েছে? এখানেই কি তিনি বসেছিলেন? নামাজ পড়েছেন এবং ভাষণ দিয়েছেন? আমার আশেপাশের এসব পাহাড় কি রাসূল (সাঃ) এর সে ডাক শুনেছে? তার সালাত, তিলাওয়াত এবং জিকিরের সাথে একাত্ম হয়েছে?! (কেনই বা হবেনা? দাউদ (আঃ) এর সাথে তো হয়েছিলো তারা, যেমন) আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ

অর্থাৎ- হে পাহাড়রাজী, তাঁর সাথে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করো।(সূরা সা'বা:১০)।

গাদীরের আশেপাশে চলাফেরা করার সময় সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন জমায়েতের চিত্র আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। উপত্যকাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সামুর

গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁদের কথা ভাবছি আমি, এমনি কোন গাছের সারির নিচে হয়ত তাঁরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পদে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমনি সময় হয়তোঃ ‘‘আস-সালাতু জামি’য়াহ’’ ঘোষণা এলো, আর তাঁরা সব ছেড়ে সে ডাকে সাড়া দিতে ছুটলেন!

আমি বিস্তৃত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছি, মনশ্চক্ষে ফুটে উঠছে সেই পবিত্র দৃশ্য; সাহাবায়ে কেরাম দলে দলে কাতারবদ্ধ হয়ে রাসূল (সাঃ) এর পাশে ভিড় করেছেন। প্রতিযোগিতা করছেন কে তাঁর বেশী কাছে পৌঁছুতে পারবেন। কিন্তু, তাঁদের সবার চেয়ে বেশি কাছে ও নিকটে ছিলেন সায়্যিদুনা আলী (রাঃ)।

আমি তাঁদেরকে কল্পনা করলাম তারা বিস্ফোরিত নেত্রে রাসূল (সাঃ) এর দিকে তাকিয়ে থেকে একাগ্র চিত্তে নবীজী (সাঃ) এর ভাষণ শুনছেন। তাঁদের কর্ণকুহরে শুধু তাঁর কথার আওয়াজই রণিত হচ্ছে। ভালোবাসা এবং সম্মানের দৃষ্টি তাঁদের চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে। রাসূল (সাঃ) এর মোবারক সান্নিধ্যে থাকার খুশি তাঁদেরকে উদ্বেলিত করে তুলছে। বিশ্বাসী অন্তরসমূহ প্রিয় মানুষটির কথাকে আত্মস্থ করে নিচ্ছে মনোযোগী কর্ণের আগেই।

এখানকার পাহাড়, পাথর এবং মাটি মনে হয় যেন সেসব ঘটনাকে সবিস্তারে বর্ণনা করছে, তুলে ধরছে সেই চিত্র।

আমি অকুস্থলে থেকে কল্পনার জগতে ঘটনাটিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। অনুভব করতে পেরেছি যে, এ স্থানটির রয়েছে ভিন্ন এক মর্যাদা, ঐতিহাসিক এই ঘটনার রয়েছে গভীর এক মাহাত্ম, এবং সেই জমায়েতের রয়েছে গাম্ভীর্যপূর্ণ এক তাৎপর্য।

আল্লাহু আকবার! সব কিছুই যেন এখানে সময়ের ভেলায় চড়ে এখনও বহমান। এবং সেগুলো তারস্বরে ডেকে ডেকে বলছেঃ রাসূল (সাঃ) এখানেই ছিলেন!

❍ ❍ ❍

গাদীরের ভাষণ

এই ভাষণপূর্ব কিছু কাজ ও উপলক্ষ্য মানুষকে এর প্রতি আকর্ষিত করে তুলার জন্য যথেষ্ঠ ছিলো। উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে গাদীরের মত অনুকূল পরিবেশ এবং মানুষ হজ্জ সম্পাদন করার পর জিলহজ্জের ১৮ তম দিনকে নির্বাচন করা ইত্যাদি সবই। কেননা তাঁরা যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন সেটির সুন্দর সমাপ্তি ঘটেছে, মক্কা থেকে বের হয়ে তাঁরা এখনও মদীনাতে প্রবেশ করেননি; সেখানে গিয়েই তো সবাইকে নিজ নিজ কর্মকান্ডে মশগুল হয়ে যেতে হবে। মাঝের এই সময়টি মানসিক প্রশান্তির একটি সময় ছিলো যখন মানব মস্তিষ্ক সহজেই যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা গ্রহণ ও আয়ত্ব করে নেয়ার মতো ফুরফুরে অবস্থায় থাকে।

তেমনি ভাবে খুতবার সময়টিও লক্ষ্য করুন। যোহরের নামাজ পরবর্তী দিনের উপযুক্ত একটি মুহুর্ত। যখন বিশ্রাম নিয়ে সবাই জেগে থাকেন। যা এদিক থেকে জুমু'আর খুতবার সময়ের সাথে তুলনা করা যায়। মদীনাতে রাসূল (সাঃ) এর বেশিরভাগ ভাষণই ছিল এ সময় তথা যোহরের সালাতের পর (৩৩)।

খুতবার জন্য মানুষের মাঝে ঘোষণা দেয়া হলোঃ "আসসালাতা জামি'আহ"[12]। এ ডাক ভীতিজনক ঘোষণা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন উদ্দেশ্যে মানুষকে একত্রিত করার নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত ছিলো।

রাসূল (সাঃ) এর খুতবার জন্য দুটি সামুর গাছের মাঝখানে একটি জায়গাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিলো। গাছের তলায় সাধারণত যে সব শুকনো ঢাল-পালা, ঝরে পড়া পাতা ও কাটাগুল্ম ইত্যাদি পড়ে থাকে সেগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের প্রচন্ড গরম থেকে ছায়া পেতে কাপড় টানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। লোকেরা জমায়েত হতে শুরু করলেন। অগ্রভাগে যারা ছিলেন তারা আগে আগেই নবীজীর কাছাকাছি স্থানে চলে আসলেন, এবং পরে যারা এসেছেন তাঁরা সেখানেই শামিল হলেন।

---

(12) "আসসালাতা" কে নাসাব ই'রাব দিয়ে পড়া হয়েছে আকর্ষণ অর্থে বুঝানোর জন্য, আর "জামি'আতান" আরবী বাক্যরীতি হিসেবে 'হাল' বা ক্রিয়া ঘটার সময়কালীন অবস্থা বুঝানোর অর্থে হবে। দ্রষ্টব্যঃ ইমাম নববী রচিতঃ শারহু সাহীহ মুসলিম (১৮/৮০)।

রাসূল (সাঃ) যোহরের সালাত আদায় করলেন, অতঃপর খুতবার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। মানুষকে নসিহত করলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁদের দায় দায়িত্বের কথা। অতঃপর বললেনঃ

"أيها الناس، هل بلّغت؟ قالو: نعم، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد".

অর্থাৎ- **হে লোক সকল! আমি কি আমার উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি?** তাঁরা উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "**হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন**"।

অতঃপর তিনি বললেনঃ "**হে মানুষেরা,আমি একজন মানুষ এবং হয়ত শীঘ্রই আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে দূত চলে আসবেন, এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। এমতাবস্থায় আমি তোমাদের জন্য দু'টি মহা মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলঃ আল্লাহ তা'আলার কুরআন। তাতে রয়েছে পথ নির্দেশনা এবং আলোকবর্তিকা। এটি আল্লাহ তা'আলার রজ্জু। যে সেটিকে আঁকড়ে ধরবে সে হেদায়েতের উপর অটল থাকবে। আর যে এটিকে ছেড়ে দিবে কিংবা এর নির্দেশীত পথে চলতে ভুল করবে সে ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে গ্রহণ করে সেটিকে আঁকড়ে ধরে রাখো**"।

এ সময় তিনি কুরআনে কারীম সম্পর্কে আরো অনেক কথা বললেন ও মানুষকে উৎসাহ দিলেন। অতঃপর বললেনঃ "**আর আমার পরিবার। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।**

অতঃপর তিনি আলী (রাঃ) এর হাত ধরে তাকে দাঁড় করালেন। এবং বললেনঃ "**তোমরা কি জানো না যে, আমি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি প্রিয়পাত্র**"? তারা বললেনঃ অবশ্যই! তিনি বললেনঃ "**তোমরা কি জানো না যে, আমি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি প্রিয়পাত্র**"? তারা বললেন, অবশ্যই! তিনি বললেনঃ "**তোমরা কি জানো না যে,আমি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি প্রিয়পাত্র**"? তারা বললেনঃ অবশ্যই! তিনি বললেনঃ

“তোমরা কি জানো না যে, আমি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি প্রিয়পাত্র”? তারা বললেনঃ অবশ্যই! আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি যেকোন মুমিনের নিকট তার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়পাত্র। তিনি বললেনঃ **অতএব** (তাহলে শুনে রাখো), **আমি যার প্রিয়পাত্র আলীও তার প্রিয়পাত্র। হে আল্লাহ! যে তার সাথে সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক রাখবে আপনিও তাকে প্রিয় করে নিন, আর যে তার প্রতি শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পোষণ করবে আপনিও তার প্রতি তেমনি আচরণ করুন** (৩৪)।

আল্লাহু আকবার! আলী (রাঃ) এর অনুভুতি তখন কেমন ছিল যখন হাজারো প্রিয়জনের ভীড়ে তিনি নিজেকেই রাসুল (সাঃ) এর সবচেয়ে কাছের ও নিকটের মানুষ হিসেবে দেখতে পেলেন?
জনতার এই বিশাল জমায়েতের সামনে রাসূল (সাঃ) যখন আলী (রাঃ) এর হাতকে নিজের হস্ত মোবারকে নিয়ে উঁচু করলেন তখন তাঁর অনুভুতি কেমন ছিল?
আলী (রাঃ) এর মনোজগতে তখন কি চলছিলো যখন তার কর্ণ এবং পঞ্চইন্দ্রিয় রাসূল (সা.) পবিত্র এই বাণীর অনুভবে অবগাহন করছিলো যেঃ **“আমি যার প্রিয়পাত্র আলীও তার প্রিয়পাত্র”**?!
আমি কল্পনায় আলী (রাঃ) কে দেখছি। তাঁর সে সময়কার আবেগ-অনুভূতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। কোন সন্দেহ নেই তিনি তখন এই ভূলোক ছাড়িয়ে উর্ধ্বলোকে বিচরণ করছেন। যেন রাসূল (সাঃ) এর হস্ত মোবারক তাঁর হাতকে আসমানের উচ্চতায় নিয়ে এসেছে আর তিনি এর তলদেশ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছেন। এবং অনুভব করছেন যে রাসুল (সাঃ) প্রদত্ত এই সম্মান ও মর্যাদার কাছে দুনিয়ার তাবৎ ঐশ্বর্য্য কতইনা তুচ্ছ ও মূল্যহীন!
রাসুল (সাঃ) এর সামনে আলী (রাঃ) এর এ কেমন শক্ত অন্তরাত্মা যা এমন সাগর দোলানো অনুভুতিকেও সহ্য করতে পেরেছে এবং স্থির থাকতে পেরেছে? এত কিছুতেও আবেগে উদ্বেলিত হয়নি। তাঁর দু'চোখে আনন্দাশ্রুর বান বয়ে যায়নি? এ তো সেই নবীর বাণী যার উপরে তিনি ঈমান এনেছেন। তিনিই তো সেই প্রিয়তম যাকে তিনি ভালোবেসেছেন এবং প্রতিদানে সেই মহৎ আত্মার ভালোবাসায় তিনিও সিক্ত হয়েছেন। এ তো সেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী যিনি নিজের প্রবৃত্তি বশত মনগড়া কোন কথা বলেন না; যা বলেন সবই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহী

হিসেবে বলেন। অতএব তিনি যা বলেছেন সত্যই বলেছেন, এবং তিনি যে ঘোষণা দিয়েছেন যথার্থই দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক আপনিও একবার আমার সাথে ভাবুন! সেই সময় আলী (রাঃ) কোন জগতে আরোহন করেছেন এবং সে কেমন আনন্দ যা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আন্দোলিত হয়েছিলো? এটি এমন এক বিরল সম্মান যার সামনে অন্য সকল সম্মান ম্লান হয়ে যায়। এমন এক গর্বের বস্তু যার আগে অন্য সকল গর্ব পানসে হয়ে পড়ে।

প্রতিবার যখনি আমি আলী (রাঃ) এর জীবনের এই অসামান্য মুহুর্তের কথা স্মরণ করি, এবং চেষ্টা করি বুঝতে তাঁর সে সময়কার অনুভব ও অনুভূতি; আমি ব্যর্থ হই, শব্দরা আমার হাতছাড়া হয়ে যায়, কোন শব্দের ভেলাতেই বাঁধতে পারিনা আমি এই মূহুর্তকে। মনের আল্পনায় এর চিত্র আঁকতে গেলে অভিব্যক্তিরা হোঁচট খেয়ে পড়ে। কোন শব্দ কিংবা বাক্য যতটুকু ব্যাখ্যা করতে সক্ষম এর চেয়েও সেই অনুভুতি আরো উর্ধ্বের ও জোরালো!

প্রিয় সূধী; আপনিও এই অবস্থাকে শুধু কল্পনা করুন এবং আপনার অন্তরে এর প্রভাব বুঝার চেষ্টা করুন। তাহলে আপনি অবশ্যই বলে উঠবেনঃ

হে আবুল হাসান! আল্লাহ তা’আলা আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ছিলো সীমাহীন। আপনারই সাজে খুশি হওয়া, আপনিই হতে পারেন আজ আনন্দিত। এমন মূহুর্তের জন্যই রাব্বে কারীম বলেছেনঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থাৎ- বলুন! আল্লাহ তা’আলার অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে। তাদের উচিত এসব কিছুর জন্য আনন্দিত হওয়া। তারা যা কিছু একত্রিত করেছে এটা সেগুলোর চেয়ে উত্তম। (সূরা ইউনুস:৫৮)।

আবুল হাসান! আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও সম্মান, এবং রাসুল (সঃ) এর এই নৈকট্য ও প্রিয়তা মোবারক হোক। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত (বাণী, সম্মান) রাখবেন (সূরা আন'আম: ১২)।[13] এবং

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে বেশী জ্ঞাত নন? (আন'আম: ৫৩)।

তাহলে এখন নবীজীর প্রিয় সাহাবীদের কথা ভাবুন। কেমন ছিলো তাঁদের তখনকার অবস্থা যখন তাঁরা তাঁদের প্রেমাস্পদ প্রিয় রাসুল (সাঃ) কে বিদায়ের রাগিণী বাজিয়ে বলতে শুনলেনঃ "আমি তো শুধুমাত্র একজন মানুষ, আমার প্রভুর ডাক নিয়ে তাঁর দূত আসার সময় হলো বলে, আমি সে ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত"। তাঁদের চক্ষুগুলো ভালোবাসার অশ্রুতে টইটম্বুর হয়ে গেলো, এবং অনাগত বিদায়ের আশংকায় শঙ্কিত অন্তরগুলো কাঁপতে লাগলো বেতস পাতার মতো।

আহ! এটি ছিলো বিদায়ী ওসীয়ত এবং প্রস্থানকালীন অঙ্গীকার। কল্পনা করুন তাহলে ভালোবাসার মানুষগুলো কিভাবে প্রেমাস্পদের এই বিদায়ী কথাগুলোকে আঁকড়ে ধরবে? কতটা মজবুত ভাবে গ্রহণ করবে? তাঁদের মনোজগতে তখন কেমনতর ঢেউ উঠবে যখন তাঁরা রাসুল (সাঃ) কর্তৃক আলী (রাঃ) কে এমন বিরল সম্মানে ভূষিত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন? তাঁর ব্যাপারে নবীজীর আহবান এবং তাঁর অধিকারের পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান দেখলেন? নিঃসন্দেহে কারো অন্তরে তাঁর ব্যাপারে নেতিবাচক কোন কিছু থেকে থাকলে সেটা তৎক্ষণাৎ ভালোবাসা ও সম্মানে পরিবর্তিত হয়েছে। দোষারোপের পরিবর্তে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে উৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁকে বরণ করে নেয়ার মানসিকতা। যারা আগে থেকেই তাঁকে ভালোবাসতেন তাঁদের ভালোবাসায় এসেছে এখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ার!

---

(13) বলাই বাহুল্য যে এখানে উপর্যুক্ত আয়াতের দ্বারা লিখকের উদ্দেশ্য "সম্মান ও মর্যাদা", রিসালাত বা নবুওয়াত নয়। কেননা রাসুলে কারীম (সাঃ) এর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের দরজা চূড়ান্ত রুপে বন্ধ করা হয়েছে, যা মুসলিমদের নিকট 'আক্বিদাতু খাতমিন নাবুওয়াহ' হিসেবে প্রসিদ্ধ, এর বিপরীত যে কোন আক্বীদার ধারক ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য। অতএব শি'আ সম্প্রদায়ের কারো কারো হযরত আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রান্ত কিছু আক্বিদা রয়েছে সেগুলো, অথবা কাদিয়ানীদের মির্জা গোলাম আহমদের ব্যাপারে খতমে নবুওয়াত বিরোধী যে সব আক্বিদা রয়েছে এর সবগুলোই ইসলাম বহির্ভূত এবং ঈমান ধ্বংসের কারণ হিসেবে যথেষ্ঠ। আল-'ইয়াজু বিল্লাহ।

আলী (রাঃ) কে সম্মানের এই মুকুট পরানোর আয়োজন হয়েছে ঠিক এমন সময়ে যখন পুরো আরব উপদ্বীপে ইসলামের জয়জয়াকার। এর অধিবাসী সকলেই এখন মুসলিম। মাত্রই তাঁরা এক লক্ষেরও বেশী লোক একত্রে রাসূল (সাঃ) এর সাথে হজ্জ আদায় করেছেন। তাঁরা রাসূল (সাঃ) ব্যতিত অন্য কাউকে অনুসরণ করেননা। তাঁর আনিত দ্বীন ছাড়া অন্য কোন ধর্মতে তাঁরা বিশ্বাস রাখেননা।

এটা ছিল আলী (রাঃ) এর ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে ইসলামে প্রবেশ করার কারণে রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্বীকৃতি। এমন একটি সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন যখন বেশীরভাগ মানুষই ছিলো ইতস্ততঃ। ইসলামের দিকে তিনি এগিয়ে আসলেন এমন সময়ে যখন অন্য সবাই পিছটান দিয়েছেন। আলী (রাঃ) ইসলামের প্রথম সূর্যোদ্বয়ের সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যখন তার কোন দলবল কিংবা অনুসারী ছিল না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এমন সময়ে যখন আশেপাশ ছিলো শিরকে আচ্ছাদিত। তাঁর সামনেই মুর্তিকে প্রতিস্থাপন করা হত। জমিনের উপরে তিনি এবং অপর তিনজন ব্যক্তি ব্যতিত আর কেউ মুসলিম ছিলেন না। এমন অবস্থায় সূর্য উদিত হল যখন আলী (রাঃ) ছিলেন ইসলামের এক চতুর্থাংশ।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল এমন ঈমানের প্রকাশ যা বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেছিলো। সেটি ছিলো এমন পদক্ষেপ যা প্রতিনিয়ত আরো বলিষ্ঠ হচ্ছিলো। দ্বীন ও রাসূলের তরে তাঁর অবদান ছিলো সর্বোচ্চ উচ্চতায়। দ্বীনের সাহায্যার্থে এবং রাসূল (সাঃ) ও রিসালাত রক্ষার্থে নিজের জীবনকে তিনি ঠেলে দিয়েছিলেন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। গাযওয়াতুল বদরে মুশরিকদের বিপক্ষে দ্বৈতযুদ্ধের প্রথম সারথি (৩৫)। খন্দকের যুদ্ধের নির্ভিক আক্রমণকারী (৩৬)। এবং খায়বারের যুদ্ধের নিরংকুশ বিজেতা (৩৭)। সুতরাং আলী (রাঃ) এর উপরোক্ত অবস্থান ও স্বীকৃতি ছিল তাঁর সেই প্রথম দিনগুলোর প্রতিদানের, যখন তিনি দাওয়াতের সাথে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে চলেছেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করেছিলো রিসালাতের সূর্যকে দেদীপ্যমান। এটি ছিল রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে আলী (রাঃ) এর অবদানের উত্তম স্বীকৃতি। কারণ তিনিই তো বলেছেনঃ নিশ্চয় ভালো আচরণ ঈমানের অঙ্গ (৩৮)।

(আর কেনইবা তিনি এর উপযুক্ত হবেন না?) আজ যদিও বিভিন্ন দল, উপদল, গোত্র এবং জাতি ইসলামে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তারা ইসলামে প্রবেশ করেছে পরবর্তীতে।

পক্ষান্তরে, আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন আরও বহু আগে। তিনি ছিলেন তাদের সবার মাঝে অগ্রগামী। এবং আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে যে (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে (আর অন্য যারা এগুলো করেনি) সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা তাদের অপেক্ষা অনেক বড় যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন, (সূরা আল হাদীদ:১০)।

অতএব গাদীরের দিনটি ছিলো আলী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা 'আনহুর সাথে উত্তম ব্যবহার ও প্রতিদান প্রদানের একটি উপলক্ষ।

❍ ❍ ❍

গাদীরের ভাষণের প্রভাব

রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় সাহাবীরা তাঁর এই বাণীকে অত্যন্ত আগ্রহভরে সাদরে গ্রহণ করে নিলেন। পরিপূর্ণরূপে একে মুখস্থ ও আত্মস্থ করে অন্যদের কাছে পোঁছে দিলেন। যার প্রমাণ আলী (রাঃ) এর প্রতি তাঁদের সম্মান ও ভালোবাসার প্রকাশ, এবং তাঁর ফাযায়েল সমূহ বর্ণনা করার মধ্যেই ফুটে ওঠেছে। এমনকি হাদীসের ইমামগণ বলেছেনঃ

لم يُرْوَ في فضائل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد الصِّحاح ما رُوي في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

অর্থাৎ- আলী (রাঃ) এর সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে যত বর্ণনা এসেছে অন্য কোন সাহাবীর ফাযায়েল সম্পর্কে সহীহ সনদে তেমনটি আর বর্ণিত হয়নি (৩৯)।

ক) যেমন এই যে সায়্যিদুনা উমর (রাঃ,) আলী (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত হলেই তাঁকে তাঁর এই মর্যাদার জন্য অভিবাদন জানাতেন, এবং বলতেনঃ

هنيئًا يا ابنَ أبي طالب، فقد أصبحتَ وأمسيتَ مولَى كلِّ مؤمن ومؤمنة.

মোবারকবাদ হে আবু তালিবের পুত্র! আপনি সকাল-সন্ধায় এমন অবস্থায় উপস্থিত হন যখন আপনাকে সকল মুমিন নর-নারী তাঁদের বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে নেয় (৪০)।

খ) রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র মুখ নিসৃত এই হাদিস সাহাবায়ে কেরামের অন্তঃকরণে আলী (রাঃ) এর প্রতি ভালোবাসায় জোয়ার এনে দিয়েছে। এই যে বুরায়দাহ (রাঃ) যিনি ইতিপূর্বে আলী (রাঃ) কে কিছুটা অপছন্দ করতেন তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) এর এ কথার পর আলী (রাঃ) এর চেয়ে প্রিয় আর কেউ আমার নিকট ছিল না (৪১)। উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ আপনি আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে এমন সব কাজ করে থাকেন যা রাসূল (সাঃ) এর অন্য কোন সাহাবীকে নিয়ে করেন না? তিনি উত্তরে বললেনঃ তিনি আমার মাওলা (বন্ধু ও উপদেষ্টা) (৪২)।

একদা মদীনার উপকণ্ঠে রাহাবাহ নামক স্থানে আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) সহ একদল আনসার সাহাবী আলী (রাঃ) এর নিকট এসে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেনঃ "আসসালামু আলাইকা ইয়া মাওলানা (হে আমাদের মাওলা, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি বললেন, আমি কিভাবে আপনাদের মাওলা হলাম অথচ আপনারা আরবেরই একটি জাতি?[14] তাঁরা বললেন,আমরা গাদীরে খুম্মে রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ **"আমি কারো মাওলা হলে; আলীও তার মাওলা"** (৪৩)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সায়্যিদুনা আবু বকর (রাঃ) এর উপর সন্তুষ্ট হোন, যিনি বলেছেনঃ সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই রাসূল (সাঃ) এর নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখার চেয়ে বেশী প্রিয় কাজ (৪৪)।

খলীফা হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সময় মিম্বারে আরোহন করে বলেনঃ "হে মানব সমাজ! রাসূল (সাঃ) কে তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খুঁজে নাও (৪৫)।

অর্থাৎ- তাঁদেরকে সম্মান করা, ভালোবাসা এবং তাঁদের সাথে হৃদ্যতা স্থাপন, ও তাঁদেরকে মহব্বত করার মাধ্যমে নবীজীর সম্পর্কের অধিকারকে রক্ষা করো (৪৬)।

এমন কোন মুসলিম আছেন কি যিনি রাসূল (সাঃ) এর বাণীঃ "আমার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি" শুনে তার অন্তরে রাসূল (সাঃ) এর পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালোবাসার উদ্রেক হবে না?

রাসূল (সাঃ) এর বক্তব্যঃ **"আমি যার মাওলা; আলীও তার মাওলা"** শুনে তার অন্তরে আলী (রাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হবে না এবং তাঁর সাহায্যকারী হবে না?

এজন্য ইমাম ইসমাইল বিন ইসহাক আল ক্বাজী বলেনঃ সে ব্যক্তি হতভাগা আলী (রাঃ) যার মাওলা হতে পারেনি (৪৭)।

---

(14) যেহেতু "মাওলা" এর অনেকগুলো অর্থের মাঝে একটি অর্থ "মনিব" হিসেবেও আসে, অথচ তাঁরা আরবেরই স্বাধীন গোত্রের মানুষ, গোলাম নন কেউ। এর প্রতিউত্তরে তাঁরা নবীজীর হাদিসের কথা বললেন, অর্থাৎ এই হাদিস মোতাবেক আপনি আমাদের মাওলা, তথা বন্ধু, অভিভাবক ও নেতা অর্থে।

(গ) রাসূল (সাঃ) এর যেসব সাহাবী সেদিন উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই এই ঘটনাকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন এবং আয়ত্ব করে সেটিকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন এই যে যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) এর বার্ধক্যতার সময়ে লোকেরা যখন তাঁকে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করার অনুরোধ করলেন, তিনি ওজর দেখিয়ে বললেন যে, তিনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং এর ফলে তিনি অনেক কিছু এখন ভুলে যান। তাই তিনি আশংকা করছেন হয়তো ঠিকমতো বর্ণনা করতে পারবেন না। এবং যিনি তার কাছে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস জানার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাকে ডেকে বললেনঃ বৎস! আল্লাহর কসম! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার সময়কাল অনেক পেরিয়ে গেছে। রাসূল (সাঃ) থেকে যেসব হাদীস আয়ত্ব করেছিলাম সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু ভুলে গেছি। অতএব আমি যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি এর প্রতি মনযোগী হও এবং সেটি গ্রহণ করো, আর যেগুলো বর্ণনা করছিনা সেগুলো নিয়ে পীড়াপীড়ি করোনা আমাকে।

কিন্তু এই যে সতর্ক থাকা এবং ভুলে যাওয়ার আশংকার কারণে বর্ণনা না করার মাঝে তিনি এ ঘটনাটিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। বরং যায়দ (রাঃ) ঘটনাটি এমন ভাবে বর্ণনা করতেন যেন তিনি এখনো সেটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছেন। সেই জায়গা এবং সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা কিছু ছিলো সবই উল্লেখ করতেন। তারপর ঘটনাটি বর্ণনা করতেন। অতঃপর খুতবা তথা ভাষণটি উল্লেখ করতেন এবং সেটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ আপনি কি এটা রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, দাওহাতে -অর্থাৎ গাদীরে খুম্মের আঙিনায়- যারা ছিলেন তাঁরা সবাই নবীজীকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁদের দু’কানে এই বাণী স্পষ্ট শুনেছেন (৪৮)।

(ঘ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এই হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং যখন আলী (রাঃ) তাঁদেরকে এর প্রমাণ উপস্থাপনের অনুরোধ করেছেন তখন তাঁরা আলী (রাঃ) সম্পর্কিত এই ঘটনার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। আলী (রাঃ) তাঁর জীবন সায়াহ্নে

কুফার রাহাবাতে[15] জনগণকে একত্রিত করে বলেছিলেনঃ আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, রাসূল (সাঃ) গাদীরে খুম্মে কি বলেছেন তা যারা শুনেছেন তাঁরা দাঁড়ান। ত্রিশজন লোক দাড়ালেন। তাঁরা স্বাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ **“তোমরা কি জানো আমি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে আরও বেশী প্রিয়পাত্র”?** তারা বললেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলেছেন যেঃ **“আমি যার মাওলা এই ব্যক্তিও তার মাওলা। হে আল্লাহ! তাকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তাকে তুমিও বন্ধু বানিয়ে নাও, এবং তাঁর সাথে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তার সাথে শত্রুতার নীতি অবলম্বন করো”**। তাদের প্রত্যেকেই বললেনঃ হ্যাঁ; তারা রাসূল (সাঃ) কে এটা বলতে শুনেছেন (৪৯)।

আলী (রাঃ) কুফার মিম্বারে থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে থাকা রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করেছেন রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে কে কে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেনঃ আমি অন্যদেরকে নয় শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে জিজ্ঞাসা করছি রাসূল (সাঃ) কে গাদীরে খুম্মে কে কে এ কথা বলতে শুনেছেন যেঃ **“আমি যার মাওলা; আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে তাকে মাওলা তথা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তাকে তুমিও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নাও এবং তার সাথে যে শত্রুতা করে তার সাথে তুমিও শত্রুতার নীতি অবলম্বন করো”**। তখন মিম্বারের পাশ থেকে ছয়জন এবং অন্য পাশ থেকে ছয়জন উঠে দাড়ালেন। তাঁরা স্বাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁরা রাসূল (সাঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছেন (৫০)।

(ঙ) সাহাবীদের মধ্য থেকে যেসব সাহাবী এ বর্ণনা রাসূল (সাঃ) থেকে শুনেছেন তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। বস্তুত এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে আলী ইবনে আবি ত্বালেব, বুরায়দাহ ইবনুল হুসাইব, যায়দ বিন আরকাম, সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস, ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ, ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরাহ, আনাস বিন মালিক, আবু সাঈদ আল-খুদরী, মালিক বিন হুয়াইরিস, হুবশী বিন জুনাদাহ, ইবনু উমার, জাবির

(15) রাহাবা দ্বারা কেউ কেউ কুফার মসজিদের প্রশস্ত স্থান ও চত্তর বুঝিয়েছেন যেখানে আলী (রাঃ) ওয়াজ, নসীহত বা বিচারের কার্য নিয়ে বসতেন। কেউ কেউ এটি কুফা নগরীর একটি মহল্লাও বলেছেন।

বিন আব্দুল্লাহ, আবু আইয়্যুব আল-আনসারী, বারা ইবনু ‘আযিব, আস’আদ বিন যুরারাহ, হুজায়ফা বিন উসাইদ আল গিফারী, ‘আম্মার বিন ইয়াসির, ইয়া’লা বিন মুররাহ এবং অন্যান্য আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম রেদ্বওয়ানুল্লাহি ‘আলাইহিম ‘আজমা’ঈনদের সূত্রে (৫১)।

সেজন্য অনেকেই বিলায়াতের হাদীসটিকে রাসূল (সাঃ) থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের রেওয়ায়েত বলে গণ্য করেছেন। একাধিক উলামায়ে কিরামের নিকট এই হাদিস মুতাওয়াতির পর্যায়ের। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন যেমনঃ ইমাম আয-যাহবী তদীয়ঃ “সিয়ারু আ’লামিন নূবালা”, আল-সুয়ুতি তাঁর “কুতুফুল আযহারিল মুতানাসিরাহ ফিল আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ”, কাত্তানী তাঁর “নুযুমুল মুতানাসিরাহ”, ‘আজালুনি তাঁর “কাশফুল খাফা”, এবং আলবানী তাঁর “আস সিলসিলাতুস সাহীহাহ” ইত্যাদি গ্রন্থে এবং এছাড়াও অন্যান্যরা তাঁদের লেখনীতে এই হাদিসকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের রেওয়ায়েত বলে অভিহিত করেছেন (৫২)।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাজার বলেছেনঃ “এর প্রচুর সূত্র রয়েছে এবং সেসব বর্ণনার অনেকগুলোর সনদ সহীহ এবং অনেকগুলোর সনদ হাসান পর্যায়ের।

অনেক আলেম গাদীরের হাদীস নিয়ে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরা সেগুলোর বিভিন্ন সূত্র এবং রেওয়ায়েতের আলোচনা-পর্যালোচনা ইত্যাদি কেন্দ্র করে রচনা করেছেন পৃথক পৃথক গ্রন্থ। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ ইমাম ইবনু জারীর আল-তাবারী, ইবনু উক্বদাহ, আল-যাহাবী প্রমুখ (৫৪)।

❍ ❍ ❍

সকল মুমিনের প্রিয়পাত্র

মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যকার বন্ধুত্ব খুবই শক্তিশালী ও মজবুত বন্ধন এবং এটি একটি দৃঢ় অবলম্বন। প্রতিটি মুমিন প্রতিটি মুমিনের বন্ধু। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অর্থাৎ- আর মুমিনরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। (তাওবাহ: ৭১)।

বস্তুত এ সম্পর্ক হলো পরস্পর সংহতি, সহযোগিতা, হৃদ্যতা এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সম্পর্ক। এবং এটি সকল মুসলিমদের মধ্যকার সাধারণ একটি বিষয়। তথাপিও রাসূল (সাঃ); আলী (রাঃ) কে নির্দিষ্ট করে প্রিয়পাত্র হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, এবং জনসম্মুখে ঘোষণা দিয়েছেন, যা তাঁর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের বিশেষ মাহাত্ম্য এবং হিকমতের প্রতি ইঙ্গিত করে।

এভাবে আলী (রাঃ) কে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা তাঁর বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্বের প্রতি পৃথকভাবে গুরুত্বারোপ করে। নবীজী (সাঃ) এর উপর্যুক্ত কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যেঃ আমার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে এবং সাহায্য করে তারা যেন আলী (রাঃ) এর সাথেও সুসম্পর্ক রাখে এবং তাকে সাহায্য করে।

বলাই বাহুল্য যে কারো ব্যাপারে এ ধরণের কোন কথার গুরুত্ব অপরিসীম, যার প্রভাব অনেক বেশী। কেননা বন্ধুত্বের বেশ কিছু স্তর রয়েছে, যার কিছু স্তর অন্যগুলোর চেয়ে উঁচু এবং মজবুত। ঠিক যেমন ভাবে সঙ্গ দেয়ারও কিছু স্তর রয়েছে। আপনি কি দেখেছেন যে যখন কেউ আবু বকর (রাঃ) এর বিশেষত্ব উল্ল্যেখ করত বলে যেঃ "সাহিবু রাসুলিল্লাহ" –অর্থাৎরাসূল (সাঃ) এর সাথী ও সঙ্গী আবু বকর (রাঃ)-", তখন সে তার এ কথার দ্বারা অন্যান্য সকল সাহাবীদের সঙ্গত্ব বুঝায়না, যদিও তাঁরা সবাই রাসুল (সাঃ) এর সাহাবী ও সঙ্গী। বরং সেখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সম্পর্কের বিশেষত্ব ও মাহাত্ম বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়, যে আবু বকর (রাঃ) হলেন নবীজীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাথী ও সহচর, যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা বিশেষত্ব দিয়েছে।

তেমনিভাবে মুমিনদের পরস্পরের সম্পর্কের চেয়ে একজন মুমিন ও রাসূল (সাঃ) এর মধ্যকার সম্পর্ক আরও অনেক বেশী মজবুত এবং শক্তিশালী। এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) যখন আলী (রাঃ) কেও এমন শক্তিশালী এবং উঁচু মর্যাদা পাওয়ার হকদার বানিয়ে দিলেন তখন সেটি আলী (রাঃ) এর বিশেষ মর্যাদার প্রতিই গুরুত্বারোপ করে। অন্যথায় তাঁর এ কথার মাধ্যমে আলী (রাঃ) এর জন্য আলাদা কোন মর্যাদা প্রমাণিত হতো না এবং এ ঘোষণার নতুন কোন বিশেষত্বও থাকতোনা (অথচ সেটিই ছিলো এ হাদিসের উদ্দেশ্য)। কেননা, মুমিনরাতো এমনিতেই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। ফলে, বিশেষভাবে যখন আলী (রাঃ) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে সেটি তাঁর বিশেষ মর্যাদা, এবং বিলায়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[16]

সুতরাং সকল মুমিনগণ একে অপরের ওলী ও বন্ধু হওয়া স্বত্বেও বিশেষভাবে আলী (রাঃ) এর বিলায়াত ও বন্ধুত্বের কথা বলে তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা

(16) বিঃদ্রঃ যে, এখানে বিলায়াত দ্বারা শি'আ সম্প্রদায় হযরত আলী (রাঃ) এর খিলাফতের অগ্রাধিকার উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, তাদের ভাষ্যমতে হযরত আবু বকর (রাঃ) বা পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদিনদের খিলাফতের মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর হক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিলায়াত দ্বারা হযরত আলী (রাঃ) উচ্চ মর্যাদা, মুসলিমদের উপর তাঁর সামগ্রিক অভিভাবকত্ব ও অধিকার, এবং পূর্বে ইশারাকৃত তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনা কেন্দ্র করে যে সব নেতিবাচক কথার উদ্ভব ঘটেছিলো এর নিরসনে আলী (রাঃ) এর অবস্থান স্বচ্ছ করাকে বুঝিয়ে থাকেন।

লেখক মহোদয় বইয়ের আগত অংশে এ বিষয়ে বিস্তারীত আলোচনা করার প্রয়াস পাবেন, এবং এটি স্পষ্ট করবেন যে যদি আসলেই রাসুল (সাঃ) এখানে বিলায়াত দ্বারা খিলাফত বুঝিয়ে থাকতেন তাহলে এটি কখনোই সম্ভব ছিলোনা যে সাহাবায়ে কেরামের সকলেই তাঁর বিদায়ী ওসীয়ত ভঙ্গ করবেন। রাসুল (সাঃ) এর সাথে সাহাবাদের যে মহব্বত, ইতা'আতের সম্পর্ক তা এই অনুমতিই দেয়না যে তাঁদের দ্বারা এমন কিছু সংঘটিত হবে।

অতএব শি'আ সম্প্রদায়ের কোন কোন দল যারা বলতে চায় যে নবীজী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাঃ) কে খলিফা নিযুক্ত না করার কারণে সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশ মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, তারা কোন ইসলামের কথা বলে সেটি আমাদের জানা নেই। ইসলাম তাদের থেকে মুক্ত। কেননা এ ধরণের জঘন্য বিশ্বাস রাখা আর ইসলামকে গোড়া থেকে সমূলে কেটে দেয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যেহেতু এর দ্বারা যারা আমাদের কাছে মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আনিত দ্বীনকে পোঁছিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশকেই ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়া হচ্ছে। আহলে বায়ত ও অল্প কিছু সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া তাদের মাপকাঠিতে আর কেউই উত্তীর্ণ নন। এমতাবস্থায় ইসলামের তেমন কিছু আর বাকী থাকেনা। উপর্যুক্ত কথাগুলো দু দলেরই বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের বাইরের খুব মৌলিক কিছু কথা, মুসলিম মাত্রই এখানে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। নচেৎ তর্ক-বিতর্কতো হাজার বছর ধরেই চলে আসছে কোন সমাধান বিহীন, আমাদের আহবান শুধু এটুকু যে যারা এমন ধারণা ও বিশ্বাস রাখেন তাঁরা আসলেই ইসলামকে কোথায় রেখে ভাবছেন সেটি যেন সৎ ও স্বচ্ছ মন নিয়ে পুনরায় ভাবেন। অন্যথায় যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণাদির বহরতো সবার কাছেই রয়েছে, যার উপযুক্ত স্থান অত্র বই নয়।

হয়েছে। এবং এর নমুনা আমরা কালামে পাকেও দেখতে পাই, যে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

অর্থাৎ- আর নামাজগুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখো। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের দিকে।(সূরা আল বাক্বারাহ:২৩৮)

এখানে "উসত্বা" বলে একটি নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যদিও তা সাধারণভাবে সালাত বলার মাধ্যমে অন্যান্য সালাতের মধ্যে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত আছে।[17] তথাপিও "উসত্বা" বলে এই নামাজকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করার দ্বারা নিশ্চিতরূপে এ সালাতের বিশেষ মর্যাদাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এটি স্বতসিদ্ধ যে "তাখসিস" বা কোন কিছুকে পৃথক ভাবে বৈশিষ্ট মন্ডিত করা তার বিশেষ মর্যাদাকেই বুঝায়।

ঠিক তেমনিভাবে বিশেষভাবে জিবরাইল ও মীকাঈল আলাইহিস সালামের নামকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে সূরা বাকারাহ নিম্ন আয়াতেঃ

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ.

অর্থাৎ- আর যে লোক আল্লাহ তায়ালা, তার ফেরেশতাগণ, তার রাসূলগণ এবং জিবরাইল ও মীকাইলের শত্রু... (সূরা আল বাক্বারাহ: ৯৮)।

অথচ তারা ফেরেশতাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। সকল ফেরেশতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম এখানে উল্লেখ করার মাধ্যমে তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তাদের অবস্থান বিবেচনায়। ঠিক এভাবেই সকল মুসলিমের মাঝে মাওলা আলী'র স্বাভাবিক একটি মর্যাদা থাকার পরেও এই ভাষণে তাঁর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে তাঁকে বিরল সম্মান এবং সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হয়েছে।

আলী (রাঃ) কে বিশেষভাবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তার সদাচরণ, শুদ্ধ অন্তর, সত্যের উপর স্থিরপদ থাকা, এবং ইসলাম গ্রহণ ও জিহাদের দিকে তাঁর অগ্রগামী হওয়া, রাসূল (সাঃ) এর সাথে নিকটাত্মীয়তা এবং প্রিয়ভাজনের আসনে

---

(17) বেশিরভাগ আলেমদের নিকট এর দ্বারা আসরের সালাত উদ্দেশ্য, কেউ কেউ ফযরের নামাজের কথাও বলেছেন।

আসীন থাকার কারণে। এর দ্বারা তাঁর দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেরই সর্বোচ্চ সম্মানের প্রাপ্তি ঘটেছে।

সাধারণ সকল মুসলিম বন্ধুত্ব ও ভার্তৃত্বের মাপকাঠিতে একটি পর্যায় পর্যন্ত একে অপরের শরীক হওয়া স্বত্বেও হযরত আলী (রাঃ) এর বিলায়াতকে পৃথক ভাবে ঘোষণা প্রদান মূলত রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাঁর এই মর্যাদার নববী সত্যায়ন। এটি এমন একজনের পক্ষ থেকে তাযকিয়া বা সার্টিফিকেট প্রদান; যিনি প্রবৃত্তি বশত কোন কথা বলেননা। বস্তুত এটি আলী (রাঃ) এর অন্তরের বিশ্বাসকেই প্রমাণ করে। এবং রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে এই স্বাক্ষ্য দেয় যে আলী (রাঃ) প্রকাশ্য এবং গোপণ উভয় অবস্থাতেই অভিভাবক ও প্রিয়ভাজন হওয়ার হকদার। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে ঈমানের দাবি করবে তার জন্য আলী (রাঃ) এর সাথে বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক হয়ে যাবে। আর তার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত, তিনিই এর হিসাব করবেন। কিন্তু এটি আবশ্যকীয় ভাবে প্রমাণিত যে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আলী (রাঃ) এর বিলায়াতের হকদার ও প্রিয়ভাজন হবার ঘোষণা তার ঈমানের ঘোষণা। মানুষ যেন জানতে পারেন যে, আলী (রাঃ) এর বাহ্যিক অবস্থা তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার মতোই। যাহের এবং বাতেন দু'টিই তাঁর সমান। এবং তিনি সত্যই অভিভাবকত্ব ও প্রিয়ভাজন হওয়ার হকদার। বস্তুত এই ঘোষণায় রয়েছে আলী (রাঃ) এর জন্য মহান সম্মান ও বিরল মর্যাদা।

তেমনিভাবে রাসূল (সাঃ) এর বাণীঃ

يحب اللهَ و رسولَه و يحبه اللهُ و رسولُه

অর্থাৎ- তিনি আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল (সাঃ) কে ভালোবাসেন, এবং আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)ও তাকে ভালোবাসেন (৫৫)।

এর মাধ্যমে মুলতঃ রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আলী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) কে ভালোবাসার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এবং তিনি এই ভালোবাসায় যে সততা,নিষ্ঠা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের উচ্চ শিখরে আরোহন করেছেন তার সত্যায়ন করা হয়েছে। এরই প্রমাণ হচ্ছে যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।

সুতরাং আলী (রাঃ) এর এই বিশেষত্ব যুগ পরম্পরায় চলমান থাকবে। তাঁর এ গুণ প্রতিষ্ঠিত বিশেষণ হিসেবে টিকে থাকবে রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় এবং

ইন্তেকালের পরেও, তেমনিভাবে আলী (রাঃ) এর আয়ুষ্কাল এবং তাঁর ওফাতের পরেও।

অতএব আলী (রাঃ) আমাদের সকলের প্রিয়জন ও মাওলা, এবং এতে আমরা গর্বিত। তিনি প্রিয়জন আমাদের পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিদেরও। রবং তিনি কিয়ামাত পর্যন্ত সকল মুমিন নর-নারীর প্রিয়জন ও নেতা। লাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতিত অন্য কেউ তার প্রিয়জনের তালিকা থেকে দূরে থাকবে না। মুনাফিক ব্যক্তি ব্যতিত কেউ তাকে অপছন্দ করবেনা।কোন মুমিন তার মর্যাদাকে অস্বীকার করবে না। কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালার দ্বীন এবং রাসূল (সাঃ) এর সাথে তার মর্যাদার অবস্থান ও অগ্রগামিতার ব্যাপারে অজ্ঞ নয়। এবং অতি অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলী (রাঃ) যার প্রিয়পাত্র হতে পারেননি (৫৬)।

কাজেই আমাদের নেতা আলী (রাঃ), এবং তাঁর স্ত্রী সকল নারীদের সর্দার আল-যাহরা, এবং তাঁদের সন্তানসন্ততি ও বংশ পরম্পরায় যারা এসেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শান্তি, বারাকাত,সন্তুষ্টি অঝোর ধারায় বর্ষিত হোক। তাদের প্রতি হোক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পবিত্র ও বরকতময় অভিবাদন।

হে আহলে বাইত! আপনাদের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বারাকাতের ফল্গুধারা অবতীর্ণ হোক। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত!

হে আল্লাহ! আপনার জন্যই তাঁদেরকে আমরা ভালোবাসি, আমাদেরকে তাঁদের সাথেই রাখুন।

❍ ❍ ❍

হাদীসুল গাদীরের অন্যান্য বর্ণনা

পক্ষান্তরে গাদীরে খুম্মের ঘটনা নিয়ে ইমামিয়া শিয়াদের কিছু ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে (যা আহলুস সুন্নাহর পূর্বে বর্ণিত প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন)। সে সব বর্ণনার মধ্যে কিছু বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং কিছু বর্ণনা দীর্ঘ। কিছু বিবরণ সামগ্রিক, আবার কিছু বর্ণনা বিস্তারিত। এমনকি গাদীরের ভাষণটি আবু মানসুর আহমাদ বিন আলী আল তাবরিসী রচিত "আল ইহতিজাজ" গ্রন্থে দীর্ঘ এগারো পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে (৫৭)।

কিন্তু এসব রেওয়ায়েত সমূহের সমন্বিত উদ্দেশ্য ছিল আলী (রাঃ) এর জন্য ইমামতের ওয়াসিয়্যাত, এবং রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর আলী (রাঃ) কর্তৃক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা। (শিয়া ইমামিয়াদের ভাষ্য মতে) আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সাঃ) কে আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে উল্ল্যেখিত ওহী প্রেরণ করেছেন এবং অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে রাসূল (সাঃ) শংকিত ছিলেন যে লোকেরা হয়ত দূরে সরে যাবে এবং এ আদেশ গ্রহণ করবেনা। সে জন্য আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করলেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

অর্থাৎ- হে রাসূল! তোমার কাছে তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে সেগুলোকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও। যদি তুমি তা না করো তাহলে তুমি তার রিসালাত তথা বার্তাকে কিছুই পৌঁছে দাওনি বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন (আল মায়িদাহ: ৬৭)।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) গাদীরে খুম্মে ভাষণ দিলেন। আলী (রাঃ) এর হাত ধরে বললেনঃ "নিশ্চয় আলী বিন আবি ত্বালিব আমার ভাই, আমার উত্তরাধিকারী ও আমার খলীফা, এবং আমার পরবর্তী তোমাদের ইমাম তথা নেতা... তোমরা আমার এ আদেশ ভালো করে শুনে রাখো এবং তা যথাযথ ভাবে মান্য করো" (৫৮)।

অতঃপর তাঁর সাথে থাকা সকল সাহাবী সেদিন রাসূল (সাঃ) এর এ কথা মেনে নিয়ে এর উপর বায়আত গ্রহণ করলেন। যাদের মাঝে আবু বকর, উমর, উসমান, মুহাজির ও আনসার এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) ছিলেন। এ ওয়াসিয়্যাত এবং অঙ্গীকারের

মাধ্যমে দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেনঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

অর্থাৎ- "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম" (আল মায়িদাহ: ৩)।

(এভাবেই তাঁরা সেদিন অঙ্গীকার করেছেন) এবং সেদিন গাদীরের বায়আতে উপস্থিত সাহাবীদের সংখ্যা ছিলো অসংখ্য, কোন কোন ভাষ্যমতে তাঁরা ছিলেন ৭০ হাজার জন। কারো কারো মতে, আরো বেশী। যাদের মাঝে ছিলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ, এবং রাসূল (সাঃ) এর পরিবার-পরিজন, তাঁর স্ত্রীবর্গ এবং মদীনার আশপাশে অবস্থানকারী বিভিন্ন গোত্রের লোকজন।

(এত কিছু স্বত্ত্বে) এই অঙ্গীকার ও ওয়াসিয়্যাতের পরিণতি ছিলো যে বায়আতের মাত্র ৮৪ দিন পরেই রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের দিনে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং ওয়াসিয়াতের বিরোধিতা করা। এভাবেই আলী (রাঃ) এর অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং রাসূল (সাঃ) এর সাথে কৃত ওয়াদার বরখেলাফ করা হয়েছে। তাঁর সাথে করা শপথকে লজ্ঘন করা হয়েছে। এবং আলী (রাঃ) এর পূর্বে রাসূলের অন্য এমন তিনজন সাহাবী খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যারা গাদীরের দিন আলী (রাঃ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। আর তারা যে আলী (রাঃ) এর আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন; সে আলীই তাদের সকলের প্রতি বায়আত গ্রহণ করে তাদের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরবর্তীতে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন উপরোক্ত এ প্রেক্ষাপটকে মূল হিসেবে গণ্য করে গাদীরের ঘটনা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ আব্দুল হুসাইন আহমাদ আল আমিনি আন-নাজাফী (মৃত্যু: ১৩৯০ হিজরী) কর্তৃক ১০ খন্ডে রচিত বৃহৎ কলেবরের "আল-গাদীরু ফিল-কিতাবি ওয়াস-সুন্নাতি ওয়াল-আদাবি" নামক গ্রন্থ। সম্ভবতঃ গাদীরে খুম্মের উপর্যুক্ত প্রক্ষাপটে এটিই সর্বাধিক বিস্তারিতভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ।

❍❍❍

ওয়াসিয়্যাত সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা

এমতাবস্থায় আমরা যদি শিয়াদের নিকট গ্রহণযোগ্য যে সব বর্ণনা রয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করি যেগুলোতে "গাদীরে খুম্মে"র ঘটনাকে অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ, হযরত আলী (রাঃ) এর ইমামত তথা নেতৃত্ব এবং রাসূল (সাঃ) এর পরে তাঁর খিলাফত প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মর্মে দাবি করে থাকে। এবং বলে থাকে যে এটি উম্মতের উপর আলী (রাঃ) এর সাথে কৃত এমন অঙ্গীকার ছিলো যা পূর্ণ করা তাদের অবশ্যকরণীয়। এরই সাথে গাদীরে খুম্মের ভাষণকে মুসলিম উম্মাহর উপর বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব, শপথ এবং প্রতিশ্রুতি হিসেবে পরিগণিত করে থাকে। এবং দাবী করে যে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর উপস্থিতিতেই আলী (রাঃ) এর হাতে বায়আতও গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি।

অতপর আমরা দেখতে পাই যে তাদের উপরোক্ত ভাষ্য মতে উক্ত ঘটনার মাত্র চুরাশি (৮৪) দিন পরে গণভাবে ওয়াদা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, সকল সাহাবী যারা এ ঘটনার সাক্ষী ছিলেন, সেদিন যারাই অঙ্গীকার ও শপথ করেছেন তাদের সকলের পক্ষ থেকে সে ওয়াসিয়্যাতকে পরিবর্তন করার মত ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করা হয়েছে মর্মে গণ্য করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় উল্লেখিত বিষয় ও বর্ণনাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরী যা আমাদেরকে সঠিক ও সত্যকে খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। এবং রাসূল (সাঃ) যদি আসলেই এ ধরণের কোন ওয়াসিয়্যাত করে থাকেন সেটি সঠিক ভাবে নিরূপণ ও তাঁর নির্দেশকে বাস্তবায়ন, এবং তার সাথে যদি এমন কোন অঙ্গীকার করা হয়ে থাকে তা পুরণ করতে সাহায্য করবে।

অতএব এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, এবং যে কোন বর্ণনার ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির চূড়ান্ত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট আলামত ও প্রমাণাদি ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত প্রক্ষাপট এবং দাবী নিয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যকিয় কর্তব্য। যাতে করে আমরা বাস্তবীকই অন্তরের ভালোবাসা এবং

জ্ঞানীয় বিচার-বুদ্ধির দাবী পূরণ করতে পারবো। এবং যথাসম্ভব ঐতিহাসিক বাস্তবতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো।

উল্লেখিত এ পদ্ধতিটি সমাজবিজ্ঞানের জনক আল্লামা ইবনে খালদূন তার সুপ্রসিদ্ধ মুকাদ্দিমার “ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে আক্বল-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর আবশ্যকীয়তা” নামক চমৎকার অধ্যায়ে বিস্তারীত ভাবে আলোচনা করেছেন (৫৯)।[18]

ফলশ্রুতিতে আমরা উল্লেখিত দাবী ও বর্ণনা সমূহকে এ দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করলে সেগুলোর অসারতায় এমন কিছু দলীল ও প্রমাণ পাই যা যে কোন ঐতিহাসিককে এখানে থামতে বাধ্য করবে, এবং যে কোন চিন্তাশীলকে এগুলোর সঠিকতা নিয়ে ভাবনায় ফেলে দিবে। কেননা সে সব প্রশ্ন ও আপত্তি এমনি গুরুতর যে সেগুলো উপেক্ষা করা কিংবা পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নরূপঃ

(১) প্রথমত এটি কি আসলেই কল্পনাযোগ্য কোন বিষয় যে বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন গোত্রের এত বিপুল সংখ্যক মানুষ রাসূল (সাঃ) এর সাথে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সবাই একসাথে এই অঙ্গীকার গোপণ করা, শপথ ভঙ্গ করা এবং তা পালন না করার বিষয়ে ঐক্যমত হতে পারেন?
কেননা এটি স্বতসিদ্ধ একটি ব্যাপার যে, যেকোন গোপন কথা যা দু’জন লোকের বেশী লোকের কানে যাবে তা এক সময় না এক সময় ছড়িয়ে পড়বেই। তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে নবীজী (সাঃ) এর প্রকাশ্যে দেয়া একটি ভাষণ যার ব্যাপারে “আস সালাতু জামিয়াতান” এর মতো গুরুতর ডাকের মাধ্যমে আহ্বান করে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো করা হলো, এবং তাতে রাসূল (সাঃ) কঠোরভাবে সবাইকে অঙ্গীকার ও শপথ করালেন, এবং তাঁরা এর পরক্ষণেই দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়লেন, পৃথিবীর বিভিন্ন

---

(18) বিঃদ্রঃ- ইবনু খালদুনেরও অনেক আগে থেকেই আহলুস সুন্নাহর উলামায়ে কেরাম, বিশেষত মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহাগণ হাদিস বর্ণনা ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে সব মাপকাঠিকে বিবেচনায় রাখতেন সেগুলোর মাঝে উপরোক্ত পদ্ধতিও অন্যতম একটি পদ্ধতি। আগ্রহী পাঠক উসুলুল হাদিস ও উসুলুল ফিক্বহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারীত আলোচনা পাবেন। পদ্ধতিগত ভাবে যা শুধু মুসলিম স্কলারগণ নন, বরং আধুনিক সময়ের ইসলাম ও মুসলিম বিষয়াবলী নিয়ে যে সব সত্যনিষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ গবেষণা করেছেন, এবং করছেন তারা এর একবাক্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষকগণও মেথোডলজিক্যালি এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

প্রান্তে নিজ নিজ গোত্র এবং অঞ্চলে ফিরে গেলেন, কিন্তু এ সংবাদটি প্রকাশ করলেন না এবং এটা জনগণের কাছে এটি সুপ্রসিদ্ধি লাভ করল না? এবং পরবর্তীতে এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা দেখেও সেখানে উপস্থিত কেউ এ ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করলেননা?!

এবং আমরা কেন এমন কাউকে দেখলাম না যিনি আবু বকর (রাঃ) কে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেছেন? কেন মদীনার আশেপাশের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এসে এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন না, অথবা এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুললেন না কিংবা আশ্চর্যবোধও করলেন না?! সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখিত অবস্থা এটিই প্রমাণ করে যে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কিংবা এতে আশ্চর্য হওয়ার মত কোন বিষয়ের অস্তিত্বই সেখানে ছিল না।

(২) রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্জে (নয় তারীখ) আরাফাহর ময়দানে ভাষণ দিয়েছেন। (দশ তারীখ) ঈদুল আজহার দিনও মীনাতে ভাষণ দিয়েছেন। এগারো তারীখে স্বীয় খচ্চরে আরোহন করা অবস্থায় পুনরায় মীনাতে বক্তব্য দিয়েছেন এবং আলী (রাঃ) সে সময় তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন। উপরোক্ত ভাষণ সমূহে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যে সব বিষয় মুসলিমদের জন্য জাতি ও মিল্লাত হিসেবে আঁকড়ে থাকা জরুরী সেগুলো স্পষ্ট করেছেন। শরীয়তের সারমর্ম হিসেবে বিবেচ্য প্রসঙ্গ সমূহ নিয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এভাবে রাসুল (সাঃ) হজ্জের সকল কাজ শেষ করে মদীনায় ফেরার পথে যখন মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছুলেন তখন গাদীরে খুম্মের ভাষণ দিয়েছেন।

বস্তুত সে সময় হজ্জে শরীক হওয়া বেশীরভাগ গোত্র নিজেদের এলাকায় চলে গিয়েছে, মানুষজনও হজ্জের জমায়েত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। যেহেতু, নবীজীর সাথে হজ্জে শরীক হওয়া লোকজন নিজ নিজ অঞ্চলের দিকে রওয়ানা গিয়েছেন, যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় এসেছেঃ লোকেরা মীনা থেকেই তাদের নিজ নিজ বাসস্থানের দিকে ফেরত চলে গিয়েছে”(৬১)। মক্কাবাসীরা মক্কায়, তায়েফের অধিবাসীরা তায়েফে, ইয়েমেনের লোকেরা ইয়েমেনে এবং নাজদবাসীরা নাজদে রয়ে গিয়েছেন। মক্কা থেকে রাসূল (সাঃ) এর সাথে

শুধুমাত্র মদীনাবাসী এবং সে পথের অন্য লোক যারা ছিলেন তারাই রয়ে গিয়েছেন, এবং একসাথে সফর করেছেন।

এমতাবস্থায় যদি আলী (রাঃ) এর খিলাফতের ব্যাপারে ওসিয়াতের বিষয়টি দ্বীনের এত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়েরই হতো (যেমনটি শিয়ারা বলে থাকেন) তাহলে রাসূল (সাঃ) ইতিপূর্বেকার বিশাল সমাবেশগুলোতেই তা বলে দিতেন, এবং উল্লেখিত তিনটি ভাষণেই এর উপর গুরুত্বারোপ করতেন। বিশেষত যখন তিনি সে সব জমায়েতে মানুষকে এই বলে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন যেঃ "সম্ভবত এই বছরের পর আমার সাথে তোমাদের আর সাক্ষাত হবে না (৬২)।

অথবা কমপক্ষে তিনি মদীনায় ফিরে এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করতেন, পুনরায় এটি নিশ্চিত করতেন, বিশেষত ইন্তেকাল পূর্ব অসুস্থতার সময়ে, যেহেতু রাসূল (সা:) জানতেন যে এ অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করবেন, যেমনটি তিনি ফাতিমা (রাঃ) কে বলেছেন (৬৩)।

এছাড়াও রাসুল (সাঃ) তাঁর অসুস্থতার প্রাথমিক সময়ে মানুষের সামনে বের হয়েছিলেন, সে সময় তাঁর মাথা কালো রঙের পাগড়ী দিয়ে বাঁধা ছিলো[19]। তিনি মিম্বারে আরোহন করলেন, এবং তাঁর বিচ্ছেদের ব্যাপারে সাহাবীদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করলেন। তাঁর পরে যিনি উম্মাতের নেতা ও খলিফা হিসেবে আসবেন তিনি যেন আনসারদের সাথে ভালো ব্যবহার করে সে ওসিয়্যাত করলেন, মসজিদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত অন্য সকলের খাওখাহ[20], এবং আলী

---

(19) হাদিসে এ সম্পর্কে যে শব্দ এসেছে (عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ) তার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, তন্মধ্যে একটি অর্থ হলো কালো রঙের পাগড়ী। অন্য আরেকটি অর্থ হলো যে তাঁর মাথা মোবারক এমন পাগড়ী দিয়ে বাঁধা ছিলো যার রঙ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো এতে বেশী বেশী সুগন্ধি মাখার কারণে। এছাড়াও নবীজীর কাঁধে সে সময় লেপ বা চাদর জড়ানো ছিলো।

(20) খাওখাহ বলা হয় এক ঘর থেকে অপর ঘর বা অপর স্থানে যাওয়ার জন্য দরজা বিহীন সংযোগ, যা দেখতে দরজার চেয়ে ছোট, বড় জানালার মতো খোলা জায়গা। তৎকালীন মসজিদে নববীতে সদর দরজার বাহিরে এভাবে চারপাশে বিভিন্ন ঘর ও রাস্তা ছিলো, উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ঘরগুলোও মসজিদে নববী ঘিরেই ছিলো, যেগুলোর দরজা মসজিদের দিকে খুলতো, হযরত আলী (রাঃ) এর ঘরও এগুলোর মাঝে একটি ছিলো। এমনিভাবে সে সময়ের মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকের পিলার লাগোয়া শেষ সীমায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বাড়ী ছিলো, সেখান থেকে মসজিদে প্রবেশের জন্য দরজা বিহীন ছোট্র জায়গা ছিলো, সেটিই "খাওখাতু আবি বাকর" নামে পরিচিত। নবীজী (সাঃ) ওফাতের পূর্বে এই ভাষণে মসযিদে নববীর সদর দরজা ছাড়া; আবু বকর (রাঃ) এর বাড়ীর এই পকেট দরজা ও আলী (রাঃ) এর ঘরের দরজা ছাড়া বাকী সব সংযোগ বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

(রাঃ) ব্যতীত মসজিদের মধ্যকার অন্য সকলের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে আদেশ করলেন (৬৪)।

প্রিয় পাঠক তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে ভাবুন! রাসূল (সাঃ) যদি তাঁর পরে খিলাফতের ব্যাপারে বাস্তবেই অঙ্গীকার করিয়ে থাকেন কিংবা অঙ্গীকার করাতে চাইতেন তাহলে এ বিষয়টি কি আবু বকর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এর দরজা বিষয়ক আদেশের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না?! এমনটি যদি আসলেই ঘটে থাকতো তাহলে এই সময়ই ছিলো সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ও স্থান (কিন্তু সেদিন তিনি এমন কিছুই বলেননি)।

এমনিভাবে রাসূল (সাঃ) যেদিন তাঁর অসুস্থতার ব্যথা একটু হালকা হয়েছে অনুভব করে মানুষের সাথে জামা'আতে সর্বশেষ নামাজ আদায় করলেন সেদিনও তিনি এই বিষয়ে কেনো কিছু উল্লেখ করেননি। অথচ সেদিন তিনি আলী ও আব্বাস (রাঃ) এর কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়েছিলেন, তাঁর শরীর এত দূর্বল হয়ে পড়েছিলো যে তাঁর পদযুগল জমিন স্পর্শ করছিলো (অর্থাৎ পা হেঁচড়ে হাঁটছিলেন)। তাঁরা দু'জন তাকে নিয়ে আবু বকর (রাঃ) এর পাশে বসিয়ে দিলেন এবং রাসূল (সাঃ) সেদিন বসে বসে মানুষকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন[21]। নামাজ শেষে হযরত আলী ও আব্বাস (রাঃ) তাঁকে যেভাবে নিয়ে এসেছিলেন সেভাবেই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন (৬৫)।

অতএব যদি ওয়াসিয়্যাত কিংবা অঙ্গীকারের কোন বিষয় বাস্তবেই থাকতো তাহলে এমন নাজুক ও শেষ মূহুর্তই কী ওয়াদা, অঙ্গীকার ও ওয়াসিয়্যাতের কথা বলার, বা সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপযুক্ত সময় ছিলো না? বিশেষত যখন আলী (রাঃ) তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থায় রয়েছেন, তাঁর কাঁধে-হাতে ভর দিয়েই তিনি হাঁটাচলা করছেন?!

এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থাই প্রমাণ করে যে গাদীরে খুম্মে রাসুল (সাঃ) কর্তৃক তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে সদচারণের ওয়াসিয়্যাতের উদ্দেশ্য ছিল যারা তাঁদের সাথে নিয়মিত উঠাবসা এবং মেলামেশা করেন সেসব মুহাজির, আনসার, ও মদীনার

(21) হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক নবীজী (সাঃ) সেদিন আবু বকর (রাঃ) এর বাম পার্শ্বে বসেছিলেন, এবং আবু বকর নবীজীর ইক্তেদায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছেন, আর মানুষজন আবু বকরের অনুসরণ করে নামাজ আদায় করেছেন। উল্লেখ্য যে এর পূর্বেই নবী (সাঃ) আবু বকর (রাঃ) কে নামাজের ইমামতির ব্যাপারে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, এবং সে মোতাবেক তিনি সে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আশপাশের গোত্রসমূহের মানুষজন। নবীজী (সাঃ) এর সাথে রয়ে যাওয়া লোকদেরকে সেদিন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে ভালোবাসার জন্য আদেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন তদীয় আহলে বায়তকে সম্মান করেন এবং তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা সম্পর্কে সদা তৎপর থাকেন সেটি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। তাঁর বংশীয় লোকদের যে কোন বিষয়ে যেন তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর কথা স্মরণে রেখে তাঁদের সাথে তেমন উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আচরণ করেন সে অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। স্পষ্টতই সেদিনের ঐ ওয়াসিয়্যাত খিলাফতের ব্যাপারে কোন ওয়াসিয়্যাত কিংবা অঙ্গিকারের ব্যাপার ছিলোনা।

(৩) এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর পরবর্তীতে খিলাফতের দায়িত্বে (যা ইমামতে কুবরা বা বড় নেতৃত্ব) অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আলী (রাঃ) কে নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর তাঁর অসুস্থতার সময়ে তিনি আবু বকর (রাঃ) কে ইমামতে সুগরা তথা ছোট নেতৃত্ব নামাজে ইমামতি করার দায়িত্ব প্রদান করবেন? (৬৬)

কেননা রাসূল (সাঃ) এর মসজিদে সালাতে ইমামতি করা এবং তাঁর স্থলে সেখানে দন্ডায়মান তো তিনিই হবেন যার প্রতি নবীজী (সাঃ) এর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নির্দেশনা থাকবে। যদি আসলেই তেমন কোন নির্দেশনা ও অঙ্গীকারের উপস্থিতি থাকতো, এমতাবস্থায় সেখানে আলী (রাঃ) ভিন্ন অন্য কাউকে যখন নামাজের জন্য সামনে এগিয়ে দেয়া হয় এবং তাঁকে মানুষের ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহলে এটি স্পষ্ট যে কারো জন্য খিলাফতের কোনরূপ নির্দেশনা কিংবা চুক্তি নেই। কারণ এমনটি কখনো সম্ভব নয় যে, কাউকে রাষ্ট্রীয় খিলাফতের মতো বড় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা হবে অথচ তাঁকে নবীজীর স্থলে স্থলাভিষিক্ত হয়ে সালাতের ইমামতির মতো ইমামতে সুগরার দায়িত্ব দেয়া হবে না।[22]

---

(22) বিঃদ্রঃ= নামাজের ইমামতিকে এখানে ইমামতে সুগরা বা ছোট দায়িত্ব বলা হয়েছে খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কাজের ব্যাপক পরিধি হিসেবে, অন্যথায় নামাজ হলো দ্বীনের স্তম্ভ এবং এতে ইমামতি করার অর্থ হলো তিনি সমাজের নেতা। যদিও উল্লেখিত প্রেক্ষাপট আমাদের বর্তমান সময়ের বাস্তবতায় বুঝা অনেকের নিকট কষ্টকর হবে, কারণ এই সময়ে সালাতে ইমামতিকে কোন বড় কিছু মনে করা হয়না। একজন বেতনভুক্ত আলেম বা হুজুর নামাজ পড়ান, মুসল্লিরা নামাজ আদায় করে চলে যান। দুঃখজনক ভাবে সে ইমামকে সমাজের নেতা মনে করা হয়না, ও সমাজের সাথে মসজিদের সেই সম্পর্ক বিদ্যমান নেই যখন মসজিদই ছিলো মুসলিম সমাজের সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু অতীতের মুসলিম

এজন্যই আলী (রাঃ) স্বয়ং বলেনঃ “নিশ্চয় তোমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) দয়ালু নবী। তিনি কোন হত্যাকান্ডের শিকার হননি এবং আকস্মিকভাবেও ইন্তেকাল করেননি। তিনি বেশ কিছুদিন যাবত মৃত্যু শয্যায় অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং প্রতিনিয়ত মুয়াজ্জিন এসে তাঁর কাছে নামাজের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতেন। এমতাবস্থায় তিনি আমি থাকা স্বত্বেও (আমাকে প্রতিনিয়ত দেখা স্বত্বেও) আবু বকর (রাঃ) কে ইমামতি করতে নির্দেশ দিয়েছেন, ফলশ্রুতিতে আবু বকর মানুষের সালাতে ইমামতি করেছেন। অতঃপর যখন রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন আমরা আমাদের দুনিয়াবী কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে নজর দিলাম। এবং আমাদের ইহকালিন কর্মকান্ডের পরিচালক (রাষ্ট্রপরিচালনা) হিসেবে সেই ব্যক্তিকে নির্বাচন করলাম যার উপর রাসূল (সাঃ) আমাদের ধর্মীয় কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন” (৬৭)।

(৪) আনসাররা সাক্বীফাতে[23] একত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত করার জন্য, যেহেতু তাঁরা ভেবেছিলেন যে তাঁরাই এখানকার আদি জনগন এবং মদীনা তাদের বাসস্থান। রাসূল (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসার আগ পর্যন্ত তারাই অত্র অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁর ইন্তেকালের পর স্বভাবতই এই দায়িত্ব তাঁদের কাছেই পুনরায় ফিরে যাবে।

সভ্যতায় বিষয়টি এমন ছিলোনা, বরং তখন যিনি রাষ্ট্রের খলীফা হতেন বা সমাজের নেতা হবেন তিনিও সাধারণত ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। এবং মসজিদে মানুষের সালাতের ইমামতি ছিলো সুউচ্চ একটি বিষয় যার দ্বারা সমাজের নেতা নির্ধারিত হতো ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সনাক্ত করা যেতো। তাঁরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পারঙ্গমতা অর্জনের সাথে সাথে ধর্মীয় বিষয়েও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতেন। সে বাস্তবতায় চিন্তা করলে রাসুল (সাঃ) কর্তৃক তাঁর অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নামাজের ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের মাঝে বরং ভিন্ন ইশারা পাওয়া যায় যে তিনি উম্মাতের পরবর্তী নেতা হিসেবে কাকে দায়িত্ব প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করছেন। সে জন্যই নবীজীর ইন্তেকালের পর খলিফা কে হবেন এ সংক্রান্ত আলোচনায় সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ উপর্যুক্ত বিষয়কে আবু বকর (রাঃ) এর খলিফা হিসেবে প্রাধান্য দেবার প্রমাণ হিসেবে নিয়েছেন, যেমন স্বয়ং আলী (রাঃ) এর একটি বর্ণনা পরবর্তী অনুচ্ছেদেই উল্লেখ করা হয়েছে।

(23) সাক্বীফা বলা হয় ঘরের বাইরের কোন স্থাপনা যেখানে মানুষজন একত্রিত হয়, আমাদের অঞ্চলের এক সময়ের বৈঠকখানার মতো। আনসারগণ নবীজী (সাঃ) এর ইন্তেকালের দিন ১২ই রবীউল আওয়ালই সেখানে পরবর্তী খলীফা কে হবেন এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে সেখানে তাঁরা হযরত সা’দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) এর ব্যাপারে মতামত পেশ করেন। পরবর্তীতে মুহাজির সাহাবায়ে কেরামও সেখানে পোঁছালে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খলীফা হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়, এবং সে মোতাবেক তাঁরা তাঁর হস্তে বায়’আত গ্রহণ করেন।

এমতাবস্থায় যদি রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে তাদের নিকট আলী (রাঃ) কে শাসক বানানোর ব্যাপারে এ ধরণের কোন অঙ্গীকারের অস্তিত্ব থাকতো তাহলে কি তাঁরা কখনোই এভাবে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন?

এছাড়াও যখন তাঁদের পরামর্শস্থলে হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের মধ্যবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রস্তাব পেশ করে বলেছিলেনঃ "আমাদের মধ্যে থেকে একজন আমীর হোক, আপনাদের মধ্যে থেকেও একজন আমীর হোক" (৬৮)।

অতএব যদি এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা থাকতো যা তাঁরা অবলোকন করেছেন এবং এর উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন তাহলে কি তাঁদের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব দেয়ার কোন অবকাশ ছিলো?

বস্তুত এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো- এবং আনসারদের ব্যাপারে আমরা এর বিপরীত কোন বিশ্বাস পোষণ করি না- যে, যদি রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে আলী (রাঃ) এর খলিফা হওয়া সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা থাকতো তাহলে আনসার সাহাবীরা কখনোই বানী সা'য়েদার সাক্বীফাতে একত্রিত হতেন না। বরং আমরা তাঁদের সকলকে আলী (রাঃ) এর নিকট মসজিদে একত্রিত অবস্থায় পেতাম যারা বলতেন যেঃ রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে যে অঙ্গিকার করিয়েছিলেন সে অনুযায়ী আমরা আপনার আনুগত্য প্রকাশ করলাম। কেননা তাঁরা ছিলেন অঙ্গিকার পূরণ ও সততার মূর্তপ্রতিক। অতএব যখন তাঁরা এমনটি করেননি তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে গাদীরে খুম্মে আলী (রাঃ) এর খিলাফত কেন্দ্র করে কোন ধরণের অঙ্গিকার কিংবা ওয়াসিয়্যাতের কোন অস্তিত্বই নেই।

(৫) আলী (রাঃ) ছিলেন শক্তিমত্তা ও সাহসীকতার প্রবাদ পুরুষ। এমতাবস্থায় এটি বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, রাসুল (সাঃ) যদি তাঁর খিলাফাতের ব্যাপারে ওয়াসিয়াত করে থাকেন, তাঁর পক্ষে অঙ্গীকারনামা ও স্বীকৃতি নিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কেন প্রকাশ্যে মানুষের মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করলেন না? জোরালো কন্ঠে তাঁর অধিকারের ব্যাপারে দাবী তুললেন না? সেদিন মানুষকে রাসুল (সাঃ) এর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার, এবং তাঁর ওয়াসিয়্যাতের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়া থেকে তাঁকে কোন জিনিস বাধা দিলো? এবং তিনি কেন নববী ওয়াদা ও

অঙ্গীকার রক্ষায় লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেননা? এতে হয়তো তিনি সেটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হতেন, অথবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিতেন যদি আসলেই তেমন কোন অঙ্গীকার কিংবা ওয়াদার উপস্থিতি থাকতো?![24]

আপনি কি মনে করেন যে, তিনি মৃত্যুকে ভয় করেছিলেন কিংবা হত্যার স্বীকার হওয়া থেকে গা বাঁচিয়ে চলেছিলেন? অথচ, তিনিই তো সে ব্যক্তি যিনি সর্বদা মৃত্যুর মুখে ছুটে গিয়েছেন এবং এর মুখোমুখি হয়েছেন যখন সেখানে যেতে অন্য কেউ ইতস্তত করেছিলো অথবা অক্ষম হয়ে গিয়েছিলো। তিনিই তো সেই বাহাদুর যিনি হিজরতের রাতে রাসূল (সাঃ) এর বিছানায় সারারাত অতিবাহিত করেছিলেন (৬৯), অথচ পরিস্থিতি ছিলো এমন নাজুক যে, প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছে অবরোধকারী শত্রুদের তরবারি তাঁকে হয়তো এখনি কেটে ফালা-ফালা করে দিবে এমন আশংকায়।

তিনিই তো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন বদরে এবং হয়েছিলেন দ্বৈত লড়াইয়ের প্রথম তরবারিধারী।

তিনিই তো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গিয়েছিলেন উহুদে এবং যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো তাঁর মাধ্যমে। মুশরিকদের পতাকাকে মাটিতে ভূপাতিতও করেছিলেন তিনি।

খন্দকের ময়দানেও মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে ‘আমর বিন আবদে উদ’কে পরাস্ত করে তাকে হত্যা করেছিলেন।

---

(24) কেউ হয়তো এর জবাবে বলতে পারে যে তিনি মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় এমন পদক্ষেপ থেকে বিরত ছিলেন, অথবা তিনি তাঁর মতের পক্ষে সংখ্যালঘু হওয়াতে তাৎক্ষনিক এমন কিছু করতে পারেননি। বলাই বাহুল্য উভয় জবাবের কোন ভিত্তি নেই, কেননা রাসুল (সাঃ) এর স্পষ্ট ওয়াসীয়্যাত ও অঙ্গীকার –যদি এমন কিছু থেকে থাকতো- পালন ও রক্ষা করা থেকে সাহাবায়ে কেরামের নিকট অন্য কোন ঐক্য বা ভ্রাতৃত্বের কোন মূল্য নেই। এর কিছু নজীর আমরা পরবর্তীতে আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ, বা উসমান (রাঃ) শাহাদাত নিশ্চিত জেনেও বিদ্রোহীদের নিকট খিলাফত হস্তান্তর করা থেকে অস্বীকার করার মাঝে পাই। তেমনি ভাবে স্বয়ং আলী (রাঃ) নিজেও খিলাফতের দায়িত্ব পালনার্থে সিফফিন ও মা’রিকাতুল জামালের মতো দু’টি বৃহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ সেই সময় তাঁর দৃষ্টিকোন থেকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষার চেয়ে সেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। অথবা তিনি একা হওয়াতে সে সময় চুপ ছিলেন এমনটি যদি কেউ বলে তাহলে বলতে হবে যে উক্ত ব্যক্তি আলী (রাঃ) এর সাহসীকতা, বীরত্ব ও হক্বের উপর অবিচল থাকার ইস্পাত কঠিন মানষিকতা সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেনা। লেখকের পরবর্তী আলোচনায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

এবং আলী'ই তো সে বীর যিনি খায়বারের যুদ্ধে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন নিম্ন কবিতা আবৃত্তি করতে করতেঃ

أنا الذي سمَّتْني أمِّي حَيْدَرَهْ (*) # كلَيْثِ غاباتٍ كَريهِ المَنْظَرَهْ

أوفِيهُمُ بالصَّاع كيل السَّنْدَرَهْ (*)

আমি সেই ব্যক্তি যার মা তার নামকরণ করেছিলেন জঙ্গলের ভয়ংকর সিংহের নামে হায়দার রূপে[25]। আমি তাদেরকে এক সা' এর বদলে সান্দারার পরিমাণে পূর্ণ করে দেই।[26]

অতঃপর মারহাবের[27] প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে হত্যা করেছেন এবং সেই দূর্গকে বিজয়ী করেছেন যা অন্যদের জন্য ছিলো অজেয় (৭০)।

আলী (রাঃ) তো ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি রাসূল (সাঃ) এর সাথে শরীক হয়ে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারলে যতটা দুঃখ ও আফসোস পেতেন অন্য কোন কারণে ততটা দুঃখ পেতেন না। সেজন্যই রাসূল (সাঃ) যখন তাঁকে তাবুক যুদ্ধের সময়ে মদীনায় রেখে যেতে চাইলেন, তিনি আফসোসের সাথে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি আমাকে মহিলা এবং শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন? তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন যেঃ "তুমি কি আমার সাথে মুসা (সাঃ) এর ক্ষেত্রে হারুন (আঃ) যেমন ছিলেন সে অবস্থানে থাকতে পছন্দ করো না"? (৭১)

অতএব আপনি কি ধারণা করছেন যে আলী (রাঃ) এর মতো এমন বীর বাহাদুর ব্যক্তির সাহসের অগ্নিশিখা তাঁর অন্তর থেকে হঠাৎ করেই নিভে গেছে? তিনি এমনি নির্জীব হয়ে গেছেন যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর চোখের সামনে তাঁকে কেন্দ্র করে নেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হচ্ছে, এবং রাসূল (সাঃ) এর এত গুরুত্বপূর্ণ

---

(25) 'হায়দার' সিংহের নাম সমূহের মাঝে একটি নাম, বীরত্বের প্রতিক হিসেবে যে নাম রাখা হয়।

(26) সা' হলো জিনিস পরিমাপের জন্য প্রাচীন আরবের একটি পরিমাপক যাতে বর্তমান সময়ের হিসেবে আড়াই কেজি থেকে তিন কেজির মতো ওজন হয়। আর সান্দারাহ হলো বৃহৎ জিনিস মাপার উপযোগী বড় ও প্রশস্ত পাত্র। কবিতার উদ্দেশ্য হলো, আমাকে কেউ ইট মারলে তাকে আমি পাটকেল ছুঁড়ে মারতে দ্বিধা করিনা, এবং তার হিসাব কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়ে দেই। আমি শত্রুদেরকে একচেটিয়াভাবে হত্যা করি।

(27) মারহাব ছিলো ইয়াহুদিদের অন্যতম প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, তার পুরো নামঃ মারহাব ইবনু আবি যায়নাব অথবা মারহাব ইবনুল হারিস। উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে হারিসের ভাই, অথবা চাচা। খায়বারের যুদ্ধে সে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলো, মুসলিম বাহিনীর কেউই তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হচ্ছিলোনা। অতঃপর আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। এটিই অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত, আর কেউ কেউ বলেছেন যে তার হত্যাকারী ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ)।

ওয়াসিয়্যাতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হচ্ছে, অথচ তিনি এতো পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে কোন শক্ত অবস্থান নিচ্ছেন না, অথবা বিপুল সাহসী হওয়া স্বত্বেও বীরত্বের কোন প্রদর্শনী তিনি সেখানে করছেন না? আল্লাহর পানাহ! আবুল হাসান স্বীয় হক আদায় করতে অক্ষম হওয়া বা নিজ অধিকার নষ্ট হতে দেওয়া থেকে বহু উর্ধের ব্যক্তিত্ব, এমনটি কস্মিনকালেও হবার নয়।

এজন্যই তার প্রপৌত্র আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবনু আলী বলেনঃ কে ঐ অবিমৃষ্য ও অবিবেচক ব্যক্তি যে মনে করে যে, আলী (রাঃ) তখন পরাজিত ও বাধ্য ছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) তাঁকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেটি তিনি রক্ষা ও বাস্তবায়ন করতে পারেননি?! আলী (রাঃ) এর শানে এর চেয়ে অমর্যাদাকর এবং অসম্মানজনক কথা আর কি হতে পারে যে নবীজী তাকে কোন আদেশ দিয়েছেন আর তিনি সেটি পূরণ করেননি বলে কিছু মানুষ ভাবার অবকাশ রাখে?! (৭২)

এতদপ্রেক্ষাপটে শায়খ আলী ত্বানতাবী (রহঃ); হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক সায়্যিদুনা আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বায়আত প্রসঙ্গে বলেন যেঃ আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) এর হাতে কিভাবে বায়আত গ্রহণ করেছেন? স্বেচ্ছায় নাকি বাধ্য হয়ে?

যদি বলা হয় যে তিনি বাধ্য হয়ে বায়আত গ্রহণ করেছেন তাহলে এটি অসত্য কথা। কেননা আলী (রাঃ) কে কেউ তার মতের বাইরে বাধ্য করতে সক্ষম হবে তিনি এমন দূর্বল লোক নন। যার প্রমাণ হলো তিনি ছয় মাস পর্যন্ত বায়আত গ্রহণ করেননি এবং তাঁকে কেউ এ নিয়ে কোন কথাও বলেনি।

আর যদি তিনি স্বেচ্ছায় বায়আত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে, তিনি কি আবু বকর (রাঃ) কে খলীফা হিসেবে যোগ্য এবং খিলাফতের উপযুক্ত জেনে বায়আত গ্রহণ করেছেন? এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করছেন, নাকি দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য তাঁর আনুগত্যের শপথ নিচ্ছেন? বস্তুত এটি একটি স্বতসিদ্ধ বিষয় যে আলী (রাঃ) খিলাফতের জন্য অনুপযুক্ত এবং বায়আত পাওয়ার অযোগ্য জেনেও পার্থিব স্বার্থে কারো আনুগত্য করবেন এমনটি কখনো হবার নয়। (সংক্ষেপিত) (৭৩)।

(৬) রিদ্দার যুদ্ধে কিছু সাহাবী আবু বকর (রাঃ) এর বিরোধিতা করে পরবর্তীতে তাঁকে মেনে নিয়েছেন (৭৪)। সাহাবীদের মাঝে অনেকে যুদ্ধ বিজিত ইরাকের ভূমি বন্টনের

বিষয়ে উমর (রাঃ) এর বিরোধিতা করেছিলেন (৭৫)। এবং আলী (রাঃ) নিজেও উসমান (রাঃ) এর সাথে হাজ্জে তামাত্তু' এর মাসয়ালায় বিরোধিতা করেছেন ৭৬)।
এসব শাখা প্রশাখাগত মাসয়ালায় যদি তাঁরা নিজেদের মতামত এবং মতভিন্নতার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করতে পারেন, তাহলে তাঁরা এই সব বিষয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কি নিজেদের বিরোধিতা প্রকাশ করবেননা? বিশেষত –অপর পক্ষের ভাষ্যমতে- যখন তাঁদের কাছে বিরোধিতার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান! অর্থাৎ আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)এর ওয়াসিয়্যাত এবং চুক্তি? বস্তুত যদি এ ধরণের কোনো চুক্তি কিংবা অঙ্গিকার থেকে থাকতো তাহলে তাঁরা অবশ্যই তাঁদের মতামত ঘোষণা করতে এবং সত্য প্রকাশ করার মতো শক্তিমান ছিলেন।

(৭) উমর (রাঃ); তদীয় পরবর্তী খলিফা নির্ধারণের জন্য ছয়জনের যে শুরা পরিষদ প্রস্তাব করেছিলেন, যাদের কোন একজনকে লোকেরা খলীফা হিসেবে গ্রহন করবে, আলী (রাঃ) তাঁদের একজন ছিলেন, এবং তিনি এই কমিটির সদস্য হওয়ার ব্যাপারে রাজী হওয়া, এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যখন পরবর্তী তিনদিন পর্যন্ত মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, আলী ও উসমান (রাঃ) এর মাঝে কাকে তাঁরা খলিফা হিসেবে বেছে নিবেন সে প্রস্তাবনা পেশ করছিলেন (৭৭), সেই সময়েও আলী (রাঃ) খিলাফাত কেন্দ্রিক কোন বিরোধিতা না করা থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হাদিসুল গাদীরে খিলাফত ও নেতা নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রকার অঙ্গীকার কিংবা ওয়াসিয়্যাতের উপস্থিতি ছিলোনা। আলী (রাঃ) এর কাছে যদি এমন কোনো অংগীকারের উপস্থিতি থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই সে ওয়াসিয়্যাত প্রকাশ করে জনগণকে এর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।
এছাড়াও রাসূল (সাঃ) যদি আসলেই আলী (রাঃ) কে কেন্দ্র করে এমন কোনো ওয়াসিয়্যাত করে যেতেন, তাহলে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) যখন মানুষকে পরবর্তী খলিফা কে হবেন সে বিষয়ে মতামত দিতে আহ্বান করছেন তখন তারা নিশ্চয়ই বলতেন যেঃ যে বিষয়ে রাসূল (সাঃ) এর সরাসরি নির্দেশনা রয়েছে, তিনি ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন, জনতাকে স্বাক্ষী রেখে উপস্থিত সকলের নিকট থেকে

অঙ্গীকার আদায় করেছেন, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে আমাদের নিকট নতুন পরামর্শ চাচ্ছেন?!

৮.পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে সাহাবীদের গুণাবলী এসেছে এবং সেখানে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। সেগুলো সকল প্রজন্মের কাছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সর্বোচ্চ চারিত্রিক মর্যাদার সনদ হিসেবেই গণ্য হয়। বায়'আতে রিদওয়ানের চেয়ে সম্মানজনক প্রশংসা আর কি হতে পারে যেখানে সরাসরি আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রশংসা করে আয়াত নাজিল করেছেন-

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে হাত রেখে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাদের অন্তরে কি আছে তা তিনি জানেন। অতপরঃ তিনি তাদের উপর শান্তিধারা বর্ষণ করলেন এবং তাদেরকে নিকট ভবিষ্যতে বিজয় দান করলেন।(সূরা আল ফাতহ: ১৮)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শুধু তাঁদের কর্মকান্ড এবং কথাবার্তার প্রশংসা করেননি, বরং এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে তাঁদেরকে সত্যায়ন করলেন যা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো জানার কোনো উপায় নেই। যা অন্তর্জামী ব্যতীত আর কারো জানার সুযোগ নেই। সে মহান স্বত্তাই তাঁদের অন্তর্নিহিত অবস্থা সম্পর্কে ইরশাদ করছেনঃ

﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾

অর্থাৎ- তাদের অন্তরে কি আছে তিনি তা জানেন। অতপরঃ তিনি তাদের উপর শান্তির ফল্গুধারা বর্ষণ করলেন।(আল ফাতহ: ১৮)।

এছাড়াও যেসব আনসাররা হিজরতের আগে থেকেই ঈমান এনে দারুল হিজরাতে বসবাস করছিলেন তাদেরকে প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

অর্থাৎ- যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরাতে বসবাস করছিলেন, তারা ভালবাসেন সেসব লোকদেরকে যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছেন। মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, সেজন্য তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। বস্তুত যেসব লোকদেরকে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম (সূরা আল হাশর: ৯), ইত্যাদি সহ অনেক আয়াতেই এটা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যেসব সাহাবীদেরকে প্রশংসা করেছেন তারা কি সংখ্যায় কম নাকি অনেক বেশী ছিলেন? রাসূল (সাঃ) এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি যদি থেকেই থাকে তাহলে তাঁরা কোথায় অবস্থান করছেন? এটা কি আদৌ সম্ভব যে, রাসূল (সাঃ) এর সাথে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রশংসিত ব্যক্তিদের একটা চুক্তি ও অঙ্গিকারের ঘটনা ঘটেছিল এবং তারা সেসব ওয়াদা রক্ষায় কোন ভূমিকা পালন না করে সেটাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে কার্পণ্য করেননি?!

এ বিষয়টিকে খুবই চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে নিম্ন কথায় যেঃ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কারীমে সাহাবীদের গুণাবলীর আলোচনা করেছেন, তাদের প্রশংসা করেছেন। এমতাবস্থায় কুরআনে যাদের প্রশংসা করা হয়েছে যদি তারা বাস্তবেই থেকে থাকেন তাহলে তারা কারা –যারা এমন অঙ্গীকার ভঙ্গের সময় কাজে আসেননি-? এবং যদি তাদের কোন অস্তিত্বই না থাকে তাহলে তো ইহা অনর্থক কথা হিসেবে পরিগণিত হবে, যা থেকে মহান আল্লাহ তায়ালার কালামে পাক অতি অবশ্যই মুক্ত!

(৯) আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় মান্যগণ্য ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে খিলাফতের দায়িত্ব হযরত উমর (রাঃ) উপর অর্পন মূলক ওয়াসিয়্যাতনামা লিখিয়েছিলেন। সে চিঠিতে তাঁর পরবর্তী মুসলিমদের খলিফা হিসেবে উমর (রাঃ) কে নির্ধারণ করেছিলেন তিনি। তাঁর ইন্তেকালের পর চিঠিটি পড়ে শোনানো হলে সবাই তাতে সম্মতি জানিয়ে তা মেনে নিলেন এবং কেউ উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি (৭৮)।

তাহলে প্রিয় পাঠক এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, আবু বকর (রাঃ) এর নির্দেশনা সংক্রান্ত যে চিঠিটি তার ইন্তেকালের পর পড়া হলো এবং সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে তা

মেনে নিলো, অথচ রাসূল (সাঃ) এর সাথে করা সুস্পষ্ট অংগীকার এবং তাঁর অবশ্য পালনীয় ওয়াসিয়্যাত তাঁরা বাস্তবায়ন করবেননা?

অথচ আবু বকর (রাঃ) এর সকল সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র কারণ ছিলো রাসূল (সাঃ) এর উপর ঈমান আনয়ন, তাঁর সাহচর্য এবং নিরংকুশ আনুগত্য। তাহলে কি সেই রাসূল (সাঃ) এর সাথে করা অঙ্গীকার এবং ওয়াসিয়্যাত পালনের চেয়ে মানুষের নিকট তাঁর সঙ্গীর ওয়াদা পূরণ করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলো?!

(১০) রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে আলী (রাঃ)এর ব্যাপারে নেয়া অঙ্গিকার যদি কুরাইশের অন্যান্যরা ভঙ্গ করে কিংবা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তাহলে তার বিপরীতে মদীনাতে একটা নিরপেক্ষ শ্রেনী আছেন যারা কুরাইশদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ কারণ,তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নন আর সে শ্রেণীটি হচ্ছেন আনসার।আনসারগণ রাসূল (সাঃ)এর সাহায্য ও হেফাজত করার ব্যাপারে বায়আত তথা শপথ গ্রহণ করেছিলেন।তারা এমন অবস্থায় তার পাশে এসে দাড়িয়েছেন যখন আরবরা সবাই একযোগে তার দিকে তীর নিক্ষেপ করছিলেন।তারা তার সামনেই তার সাহায্যার্থে এসে যুদ্ধের ময়দানে ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেছেন।আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশংসা করে বলেছেনঃ

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾

অর্থাৎ- ... যারা ঈমান এনে দারুল হিজরতে বসবাস করছিলেন (আল হাশর: ৯)।

এটা কি বিশ্বাস করার মত যে,তারা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর নির্দেশনা ও ওয়াসিয়্যাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে অন্য কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন?

হিজরাতের দিনেই তারা তাদের দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন,তারা শত্রুদের থেকে নিজেদেরকে যেমন রক্ষা করেন সেভাবে তাকেও রক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনে প্রানপণে লড়াই করবেন।(৭৯)তারা ছিলেন সততা ও ওয়াদা পালনের মুর্ত প্রতীক।এমনকি এদের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনকে পূর্ণ করবেন।এটা কি কল্পনা করা যায় যে,তারা তাদের অঙ্গীকার থেকে দূরে সরে গিয়ে যার ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত করেননি তার দিকে ঝুকে পড়বেন? তারা মদীনাতে তাদের নিজেদের বাসস্থানেই আছেন।তারাই সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ট।তারা দূর্বল চিত্ত কিংবা সংখ্যায়

দুর্বল অবস্থানে ছিলেন না যে তারা পরাজিত হবেন।যতক্ষণ না তারা সেটাকে সমর্থন করেন কিংবা সেটাতে সন্তুষ্ট থাকেন।

এ ছাড়াও আলী (রাঃ)আত্মীয়তার দিক থেকে আনসারদের নিকটবর্তী অবস্থানে ছিলেন এবং তিনি অন্যদের চেয়ে তার বেশী নিকটবর্তী ছিলেন।তারা ছিলেন তার মামা বংশীয় তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মামা বংশীয়। জাহেলী যুগে তার পূর্ব পুরুষেরা মদীনা থেকে মক্কায় আব্দুল মুত্তালিবের সাহায্যার্থে চলে গিয়েছিলেন যখন তার চাচা নাওফাল তার আঙ্গিনায় নিয়ন্ত্রন আরোপ করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।তিনি তখন তার মামা বংশ খাজরাজের সাহায্য চাইলেন।তারা মদীনা থেকে এসে আবতাহ- নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং তার অধিকারকে পূনরুদ্ধার করে দিলেন।

এ বিষয়ে কবি শাম্মার বিন উমাইমির আল কিনানি বলেছেন,(৮০)

لعمرى لأخوال الأغر ابن هاشم ****من أعمامه الأدنين أحنى و أوصل

أجابوا على نأى دعاء ابن اختهم **** و قد ناله بالظلم و الغدر نوفل

فما برحوا حتى تدارك حقه**** و رد عليه بعد ما كاد يؤكل

جزى الله خيرا عصبة خزرجية**** توافوا على بر و ذو البر أفضل

ইসলাম আসার পর তারা বর্তমানে তাদের পুত্র আলী (রাঃ)কে আরও বেশী সাহায্য করবেন এটাই ছিল বাস্তবতা।তিনি তাদের কওমের বোনের ছেলে হওয়ার কারণে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন।যদি তারা বিশ্বাস করতেন যে এটা তার অধিকার এবং তাকে এ অধিকার আদায় করে দেয়া উচিত তাহলে তারা আলী (রাঃ)এর অধিকার আবু বকর (রাঃ) কিংবা অন্য কাউকে দিতেন না।

১১.লোকেরা আবু বকর (রাঃ)এরহাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং সাদ বিন উবাদাহ (রাঃ)এর বিষয়টি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি বায়আত গ্রহণ করেননি।বর্ণিত হয়েছে,আবু বকর (রাঃ)তাকে বার্তা পাঠিয়ে বললেন,এসে বায়আত গ্রহণ করুন।মানুষেরা এবং আপনার সম্প্রদায় বায়আত গ্রহণ করেছেন।তখন তিনি বলেছিলেন,আল্লাহর কসম! আমি বায়আত গ্রহণ করব না।তখন বাশীর বিন সা'দ

(রাঃ)বললেন,হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর খালীফা!সে অগ্রাহ্য করেছে এবং সে অনেক অন্দরমহলে চলে গেছে।এ বিষয়ে আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।আপনাদের খিলাফাতের বিষয়টি বাস্তবে রূপ নিয়েছে এবং সে মাত্র একজন লোক।আবু বকর (রাঃ)তার নাসিহাত গ্রহণ করলেন এবং তার বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। তিনি মদীনাতে নিজের কওমের লোকদের মধ্যে নেতা,ভদ্র ও সম্মানিত হয়েই রইলেন।আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর উমর (রাঃ)খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে সা'দ (রাঃ)তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেননি।উমর (রাঃ)সা'দ (রাঃ)এর সাথে সাক্ষাত করলে সা'দ (রাঃ)তাকে বললেন,এ দায়িত্ব আপনার কাছে এসেছে এবং আল্লাহর কসম!আপনার চেয়ে আপনার সাথীই আমাদের কাছে বেশী প্রিয় ছিলেন।(৮২)

এতদসত্ত্বেও সা'দ (রাঃ)খাজরাজ গোত্রের নেতা এবং সম্মানিত ব্যক্তিই ছিলেন।দুজন খলীফার সময়কালে তাদের কাছে বায়আত গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তার নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে তার মান-মর্যাদা এবং নেতৃত্বের ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।

এখন আমরা সা'দ (রাঃ)এর অবস্থানকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করব। সেগুলো হল-

<u>প্রথমতঃ</u> সা'দ (রাঃ)বায়আত গ্রহণ করেননি এবং তিনি এটাকে আলী (রাঃ)এর অধিকার মনে করে এটার বিরোধিতা করেছিলেন এমনটি নয়।এমনটি হলে তিনি তা ঘোষণা করতেন এবং সকল আনসার সাহাবী তাকে অনুসরণ করতেন। কিন্তু,তিনি বায়আত গ্রহণ করেননি তার নিজের এবং নিজের কওমের অবস্থান এবং বিষয়টিতে তাদের সমান অধিকারের বিষয় জড়িত থাকার কারণে।সা'দ (রাঃ)অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং মন থেকে তিনি বায়আত গ্রহণ করার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> সা'দ (রাঃ)যখনবায়আত গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আমরা কি এটা মনে করতে পারি যে,আলী (রাঃ)এর ব্যাপারে সাহাবীগণ কর্তৃক অঙ্গীকার প্রদান করা সত্ত্বেও আলী (রাঃ)সা'দ (রাঃ)এর মতই তা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন? আবু বকর ও উমর (রাঃ)সা'দ (রাঃ)বায়আত না করায় তাকে এড়িয়ে যাননি।আলী (রাঃ)বায়আত না নিলে কি তারা তাকে এড়িয়ে চলতেন? আবুল হাসান অনেক বড়

সম্মানের আসনে আসীন ছিলেন এবং কোন বিষয়ে নিজের মতের ব্যাপারে সা'দ (রাঃ)এর চেয়েও সাহসী ছিলেন।এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে রাসূল (সাঃ)অঙ্গীকার ও চুক্তি নিয়ে থাকলে সেটার পরিণতি কি হবে?

১২. আবু বকর (রাঃ)মক্কার কুরাইশ বংশের প্রভাবশালী কোন গোত্রের সন্তান ছিলেন না।বরং তিনি ছিলেন বানী তাঈম গোত্রের সন্তান যাদের না ছিল কুরাইশদের মত নেতৃত্ব,না ছিল পানি পান করানোর কাজে অংশগ্রহণকারী,কাপড় পরিধান করানো,পতাকা ওড়ানো,মিটিং ডাকা,অস্ত্রাগার কিংবা ঘোড়ার আবাসস্থলের কাজে।(৮৩)

আবু বকর (রাঃ)যদি কুরাইশ বংশের যেসব গোত্র নেতৃত্ব ও সম্মানের প্রতিযোগিতায় ছিল যেমন বানী মাখজুম ও বানী আব্দুদ দার ইত্যাদি তাদের মধ্য থেকে জন্ম নিতেন তাহলে আমরা বলব,তিনি তার গ্রুপ ও আত্মীয়স্বজনসহ বানী হাশেমের উপর প্রতিযোগিতা করেছেন যেমনটি রাসূল (সাঃ)এর নাবুওয়াতের বিপরীতে আবু জাহল প্রতিযোগিতা ও হিংসা করেছেন।কেননা,বানী আবদে মানাফ বানী মাখযুম তাদেরকে সম্মান প্রদান করতে চায়না।কিন্তু আবু বকর (রাঃ)এর বংশীয় কোন ক্ষমতা ছিল না যার মাধ্যমে তিনি নিজে শক্তির আধার হবেন বরং তার কাছে ক্ষমতা ছিল মুসলিমদের শুরা তথা পরামর্শসভার সিদ্ধান্ত নামক ক্ষমতা এবং নির্বাচনের শক্তি আর তাদের বায়আত তথা বশ্যতা স্বীকার এবং পছন্দ করা এবং মনের সন্তোষ।

তেমনিভাবে উমর (রাঃ)কুরাইশ বংশের গুটি কয়েক বড় কোন একটি গোত্রেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।এজন্য যখন রাসূল (সাঃ)হুদায়বিয়ার ঘটনার সময়ে তাকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করতে চাইলেন তিনি মাফ চাইলেন এবং বললেন-হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!মাক্কাতে বানী আদী গোত্রের এমন কেউ নেই যে আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে।(৮৪)

অতএব, দুজন সাহাবীর মধ্য থেকে কেউই বানী হাশেম গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন কোন পজিশনে ছিলেন না যার কারণে এটা বলা যেতে পারে যে,প্রতিযোগিতা করে তারা এটাকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।তারা শক্তিশালী কয়েকটি গোত্রের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না যার কারণে বলা যেতে পারে যে,শক্তিমত্ত্বা খাটিয়ে

তারা অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন।বরং তাদের কাছে ক্ষমতার উৎস ছিল মুসলিমদের শুরা তথা পরামর্শসভার সিদ্ধান্ত এবং তাদের নির্বাচন ও সন্তুষ্টি আর সেটাই তাদের প্রতি মুসলিমদেরকে চুক্তি এবং বায়আতের দিকে পরিচালনা করেছে।

১৩.আহযাবের যুদ্ধের দিনে মুসলিমরা রাসূল (সাঃ)এর সাথে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন।এর চেয়ে কঠিন অবস্থা তাদের সামনে আর আসেনি।তাদের উপর এসেছিল প্রচন্ড ঠান্ডা,ক্ষুধা,ভীতি এবং কঠিন পরিশ্রম।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١)﴾

অর্থাৎ- যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল (আল আহযাব:১০-১১)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র এ আয়াতে ছাড়া অন্য কোথাও পৃথিবীর কোন কষ্টকে আখিরাতের কষ্টের সাথে তুলনা করেননি।কিন্তু,এটার বিবরণ ছিল আখিরাতের মতই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ﴾

অর্থাৎ,তাদেরকে সেদিনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিন যা কাছাকাছি এসে গেছে।যেদিন কলিজা মুখের মধ্যে এসে যাবে আর সব মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। (সূরা আল মু'মিন/গাফির:১৮)

চিন্তা করে দেখুন তো!অবরোধের দিনগুলোতে রাসূল (সাঃ)এর সাথে থাকা সাহাবীরা ছিলেন প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায়। খাবার ছিল খুবই কম। মানুষের শরীর ছিল খোলা এবং আবহাওয়া ছিল প্রচন্ড ঠান্ডা।তারা খন্দক খুড়তে খুড়তে এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হতে অনেক ক্লান্ত হয়ে যেতেন।সাথে ছিল সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণ শত্রুর ভয় যারা তাদের মুখোমুখি হবে।সামনে থেকে ঝাপিয়ে পড়বে তাদের উপরে।আর যেসব ইহুদী বিশ্বাস ঘাতকতা করে তার পিছনে আসতে চায়নি তারা ছিল সংখ্যায় কম এবং পরিশ্রম ছিল অনেক বেশী।মুনাফিকরা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে

প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল।তাদের মুনাফেকীর বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

﴿ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا﴾

অর্থাৎ,তারা বলল:আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূল (সাঃ)আমাদের সাথে শুধু প্রতারণাপূর্ণ ওয়াদা দিয়েই গেছে।(আল আহযাবঃ ১২)

হায়রে কষ্ট! সেটা এমন কষ্ট যাতে অত্যন্ত শক্ত হৃদয়গুলোও দূর্বল হয়ে যায়।

তাদের অন্তরে যদি সামান্যতম সন্দেহ দানা বাঁধত তাহলে এ কঠিন মুহূর্তে তারা খন্দকের কাজ ফেলে মুশরিকদের সাথে গিয়ে শরীক হতেন।আবু বকর (রাঃ)শরীক হতেন বানী তাঈম গোত্রের সাথে,উমর (রাঃ)শরীক হতেন তার নিজ গোত্র বানী আদীর সাথে,উসমান (রাঃ)শরীক হতেন তার চাচাত ভাই মুশরিক নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে এবং তারা বলতেন আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ)এর সাথে ছিলাম এবং এখন তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসলাম।তারা যদি এমনটি করতেন তাহলে তারা নিজ জাতি,গোত্র,বংশ,সম্মান- মর্যাদা এবং অভ্যর্থনা সবই পেতেন।তারা তাদের কাছ থেকে যেসব ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেগুলোও তারা তাদেরকে ফেরত দিতেন।

কিন্তু ইচ্ছা,আগ্রহ কিংবা সিদ্ধান্ত তো দূরের কথা বরং এমন চিন্তা তাদের মনে জায়গা করে নেয়ার চেয়ে তাদের কাছে আরো বেশী প্রিয় ছিল আগুনে জ্বলে পুড়ে কয়লায় পরিণত হওয়া।কিন্তু,এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থা কেমন ছিল সে ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে তাদেরকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما﴾

অর্থাৎ,আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)আমাদেরকে এটিরই ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (সাঃ)সত্যই বলেছেন।আর এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রাকে আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে। (আহযাব:২২)

আমরা কি মনে করি যে,যারা এ কঠিন মুহূর্তে রাসূল (সাঃ)এর সাহচর্যে ছিলেন এবং কঠিন মুহূর্তেও তার কথা মেনে চলেছেন সেই একই ব্যক্তিবর্গ তার ইন্তেকালের পরে তার সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গ করবেন?

১৪.উহুদের দিন যখন মুসলিমরা আক্রান্ত হলেন এবং খবর ছড়িয়ে পড়ল যে,রাসূল (সাঃ)নিহত হয়েছেন তখন মুসলিমদের মধ্যে একটা বিষাদ নেমে আসল।তারা পাহাড় ও গিরি গুহাতে বিভক্ত হয়ে পড়লেন এবং একদল লোক যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেন।যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন উসমান (রাঃ)(৮৬)।কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলেন? তারা পালিয়ে গিয়েছিলেন মদীনাতে।উদ্দেশ্য ছিল অবশিষ্ট্য মুসলিমদের সাথে সাক্ষাত করা এবং রাসূল (সাঃ)এর রেখে যাওয়া অবশিষ্ট জিনিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।যেমন তার মাসজিদ,বাড়ী এবং নামাজের স্থান ইত্যাদি।

উসমান (রাঃ)চাইলে মুশরিকদের সাথে শরীক হতে পারতেন যার নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান।তার সাথে শরীক হলে পেতেন অনেক সম্মান এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা।অন্যান্য মুহাজিরদের অবস্থাও ছিল একই রকমের।তারা তাদের সাথে শরীক হলে তাদের প্রত্যেকেরই এমন একটা গ্রুপ ছিল যারা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করতেন।কিন্তু,রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে ধারণা নিয়েও এ বিষয়টি তাদের ব্রেনে উদয় হওয়া কিংবা এটার প্রতি সামান্যতম ইচ্ছাও তাদের অন্তরে দানা বাধার সুযোগ পায়নি।তার দ্বীন অবশিষ্ট্যই ছিল এবং তারা সেটাকে আকড়ে ধরেই রেখেছিলেন।

এজন্য তাদের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আলোকপাত করেছেন এবং পরবর্তীতে এটাকে মাফ করে দেয়ার সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ,তোমাদের মধ্য থেকে যারা দুটি দলের পরস্পর মোকাবিলার দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তাদের এ পদস্খলনের কারণ ছিল-তাদের কোন কোন দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পা টলিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল। (সূরা আলে ইমরান:১৫৫)

তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু,এ ভয়াবহ মুহুর্তে তারা দ্বীন থেকে পালিয়ে যাননি।

কেউ কি মনে করে যে এরা হয়ত তার ইন্তেকালের পর তার আনীত দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে পারে? তারা সে সমস্ত লোক যারা তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং তার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছে মর্মে খবর পাওয়ার পরেও তার আনীত দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।দ্বীনের উপর অবিচল থাকার পথে তা তাদেরকে বাধাঁ দিতে পারেনি।রাসূলকে (সাঃ)হারানো সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেও রিসালাহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কল্পনাও করেননি।
এমন কঠিন পরিস্থিতিতে যিনি তার দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারেন তিনি এরপরে আর কখনও কোন অবস্থাতেই তা থেকে দূরে থাকতে পারেননা।

১৫.উসমান (রাঃ)কে অবরুদ্ধ করলে তিনি মানুষকে তার ইসলামের প্রথম দিকে ইসলামে প্রবেশ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।স্মরণ করিয়ে দিলেন,রাসূল (সাঃ)এর সে বক্তব্য যেখানে তিনি বলেছেন,আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।তোমরা কি জানো রাসূল (সাঃ)এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বলেছেন,ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যে খরচ করবে তা গ্রহণ করে নেয়া হবে।অতঃপর আমি সে শত্রুবাহিনীকে প্রস্তুত করলাম? তারা জবাব দিলেন হ্যাঁ।তারপর তিনি বললেন,আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি।রুমা কুপ থেকে টাকা ছাড়া অন্য কেউ কখনও পানি পান করতে পারেনি অতঃপর আমি তা কিনে নিলাম এবং সেটাকে ধনী,গরীব এবং পথচারী সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলাম।তারা বললেন,জি হ্যাঁ।এভাবে আরও বেশ কিছু জিনিসকে গণনা করলেন।(৮৭)
কিভাবে উসমান (রাঃ)রুমা কূপের কথা জনগণের সামনে বলতে পারলেন অথচ আলী (রাঃ)সব মানুষের সামনে রাসুল (সাঃ)কর্তৃক খিলাফাতের নির্দেশনার বিষয়ে বলতে পারলেন না?

১৬.সাহাবীদের সত্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার নজির সত্যিই আশ্চর্যজনক।যেমন ধরি আবু হুজাইফা বিন উতবা বিন রাবী’আ (রাঃ)এর কথাই।তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।তিনি দেখতে পেলেন তার চোখের সামনে তার পিতা,চাচা এবং ভাই সবাই মুসলিমদের তরবারীর নিচে নিহত হচ্ছেন।তারপর দেখলেন তার পিতার লাশকে টেনে হিচড়ে বদর প্রান্তরের ময়লা ফেলার স্থানের দিকে নিয়ে গিয়ে তাকে সেখানে নিক্ষেপ করা হল।এমন পরিস্থিতিতে কঠিন হৃদয়ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে

যায়।কিন্তু সাহাবীরা সত্যকে আকড়ে ধরে অত্যন্ত শক্তভাবে অবিচল ছিলেন।এজন্য তার পিতার লাশকে টেনে হিচড়ে আবর্জনা ফেলার স্থানের দিকে নিয়ে যেতে দেখে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।তিনি ঠাই দাঁড়িয়ে এগুলো দেখছিলেন।রাসূল (সাঃ)তাকে বললেন,আবু হুজাইফা তোমার আব্বার অবস্থা দেখে তোমার বুঝি খুবই কষ্ট হচ্ছে? তিনি বললেন,হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!আমার কি হয়েছে যে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনব না? কিন্তু চিন্তাধারা ও সম্মানের দিক থেকে নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে তার কোন জুড়ি ছিল না।আমি কামনা করেছিলাম আল্লাহ তায়ালা তাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত করবেন।কিন্তু আমি যখন তার এ পরিণতি দেখলাম ৎখন একটু কষ্ট লেগেছে।(৮৮)
এটা কি কল্পনা করা যায় যে যারা সত্যকে আকড়ে ধরেছেন তারা আকড়ে ধরে রাখা সত্যকে পিতামাতা ও তাদের সর্বাধিক নিকটাত্মীয়দের উপর অগ্রাধিকার দেন? রাসূল (সাঃ)এর সিদ্ধান্ত এবং চুক্তিনামা ও ওসিয়্যাত থেকে আবু বকর (রাঃ)কিংবা অন্য কারো কারণে কি তারা দূরে সরে যেতে পারেন?
না!আল্লাহর কসম যে কোন প্রকার চুক্তি কিংবা ওয়াসিয়্যাত কিংবা অঙ্গীকার তাদেরকে সত্য থেকে টলাতে পারবে না।তারা সত্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সত্যাশ্রয়ী ছিলেন।সেগুলোর উপর অটল থাকার ক্ষেত্রে ছিলেন সবচেয়ে সাহসীর ভুমিকায়।

১৭.রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকালের পর মুরতাদরা ইসলাম ত্যাগ করে আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (৮৯)তাদের সাথে যুদ্ধের কারণগুলোর মধ্যে একটি হল যাকাতকে কিংবা আবু বকর (রাঃ)এরনেতৃত্বকে অস্বীকার করা।আর তাদের উদ্দেশ্য ছিল নেতৃত্ব তাদের হাতেই থাকবে।যেমনটি তাদের একজন বলেছেন (৯০):

أطعنا رسول الله ما كان بيننا**** فيا لعباد الله ما لأبي بكر

আবু বকর (রাঃ)এর সামনে কেউ নিশান উড়িয়ে বলতে পারেনি যে,আমাদের কাছে রাসূল (সাঃ)এর পক্ষ থেকে আলী (রাঃ)কে নেতৃত্ব দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে ।আমরা সে বিষয়ে আপনার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হব।যদি আলী (রাঃ)এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)কর্তৃক গৃহীত কোন অঙ্গীকারের অস্তিত্ব থাকত তাহলে আবু বকর (রাঃ)এর

বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এটা সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হিসেবে গণ্য হত।

১৮.বানু হানিফা গোত্র নিজ গোত্রীয় ব্যক্তি মুসাইলামাকে মিথ্যাবাদী জেনে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বানু আসাদ গোত্র তুলাইহা আল আসাদীর বিরুদ্ধে,বানু তামীম সাজাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন প্রত্যেকেই মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত ছিল। এটা কি উপলব্ধি করা যায় যে,তার চেয়ে আরও উত্তম ব্যক্তি আলী (রাঃ)এর অধিকার ছিল; তদুপরি তার সাথী এবং সাহায্যকারীরা তার পক্ষে লড়াই করতেন না?!

১৯.সাহাবীরা রাসূল (সাঃ)জীবনের সকল ছোট বড় বিষয়াদির দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নজর রাখতেন। এটা অমুক জায়গা যেখানে রাসূল (সাঃ)অবস্থান নিয়েছেন,এই পথ দিয়ে তিনি চলাচল করেছেন,অমুক খুটির সামনে তিনি নামাজ আদায় করেছেন এমনকি তার কথা বলার ভঙ্গি,দাঁড়ানো,বসা,হাঁটাচলা,ঘুম এমনকি ঘুমের ভিতরে তার শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়ার ভঙ্গি,নামাজে তার দাড়ি নাড়ানো ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন এবং তারা তার কথাবার্তা ও বর্ণনাকে যত্ন করে সংরক্ষন করেছেন। কারণ,রাসূল (সাঃ)থেকে সহীহ বর্ণনায় কোন কিছু পাওয়া গেলে সেটা উম্মাহর জন্য বিশাল উত্তরাধিকার।তবুও কি এটা ভাবার অবকাশ আছে যে,রাসূল (সাঃ)এ ধরণের কোন অঙ্গিকার নিয়েছেন তারপর তারা সেটাকে গোপণ করেছেন এবং গোপন থেকে গেছে যা প্রকাশ পায়না এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না?

২০.সাহাবীরা ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন গোত্র,আত্মীয়-স্বজন এবং মিত্রদের সমন্বয়ে একটা দল।তাদের পরস্পরকে একত্রিত করেছে শুধুমাত্র দ্বীন ও রাসূল (সাঃ)এর ভালোবাসা।যদি ধরে নেয়া হয় তাদের মধ্যে কোন একটি দল অন্য দিকে ঝুকে গিয়েছেন কিংবা বিষয়টি গোপণ করেছেন তাহলে অন্যান্য গ্রুপগুলো কোথায়? তারা তো সত্য ছাড়া অন্য কোন পক্ষকে কোন মতেই মেনে নিবেন না।একটি গোত্র যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তাহলে অন্য গোত্রগুলো কোথায়? যদি একটি শহর একদিকে ঝুকে পড়ে তাহলে অন্য শহরের লোকগুলো কোথায়?

২১.আসহাবে সুফফার সাহাবীরা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)এর দিকে হিজরত করেছেন।নিজেদের বাড়ীঘর এবং পরিবার পরিজনকে ত্যাগ করে এসেছেন এবং

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জীবন চালানোর পথে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন।ছিল না প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়,না ছিল খাবারদাবার।দিনের পর দিন কাটিয়েছিলেন ক্ষুধার্ত অবস্থায়।রাসূল (সাঃ)এর অনুসরণ ব্যতীত তাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সাঃ)এর দাওয়াত ও পথনির্দেশ শুনবেন।তাদেরকে রাসূল (সাঃ)এর নেয়া অঙ্গিকার এবং চুক্তির কথা গোপণ রাখতে এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করবে এমন সাধ্য আছে কার?

২২.আলী (রাঃ)এর কাছে এমন অবস্থায় খিলাফাতের দায়িত্ব আসেনি যখন আলী (রাঃ)সেটার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষায় ছিলেন।কিন্তু এটা তার কাছে এমন অবস্থায় এসেছে যখন তিনি সেটার জন্য খুশি ছিলেন না।তিনি বলেছিলেন, আমাকে ছেড়ে দাও এবং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে খুঁজে নাও।(৯১)
এটা কিভাবে সম্ভব যে,তিনি বললেন না,হ্যাঁ এটা রাসূল (সাঃ)কর্তৃক গৃহীত ওয়াদা এবং তোমাদের উপরে থাকা অঙ্গিকার।কিন্তু অপারগতা প্রকাশ করার সময় তারা কেন তাকে বলেননি যে,রাসূল (সাঃ)এর ওয়াদা অনুযায়ী আপনিই এটার উপযুক্ত পাত্র এবং আপনাকে ছেড়ে অন্য দিকে আমরা যাব না এটা রাসূল (সাঃ)কর্তৃক গৃহীত অঙ্গিকার এবং আমাদের কাছে আসা ওয়াসিয়্যাত?

২৩.ইবনুজ যুবাইর (রাঃ)ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বের হলেন।লোকেরা তার সাথে শরীক হলেন।কাবা ঘরকে ধরে রইলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন।(৯২)তার সাথে ছিল না কোন অঙ্গিকার কিংবা ওয়াসিয়্যাত।
ফুফাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)যা করতে পারলেন আলী (রাঃ)কি তা করতে সক্ষম ছিলেন না? কিংবা তার ফুফাত ভাই যা করতে পেরেছেন তা করার মত সক্ষমতা কি হাসানের ছিল না? অথচ,তিনি ওয়াসিয়্যাতের সাক্ষী ছিলেন এবং অঙ্গিকার গ্রহণ করতে দেখেছেন।

২৪.লক্ষ্য করুন সেসব লোকদের অবস্থার দিকে যাদেরকে রাসূল (সাঃ)এরনেয়া ওয়াদা এবং অঙ্গিকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন মর্মে তুলে ধরা হচ্ছে তারা তো সেসব লোক যারা মক্কাতে একাকী দাওয়াত দেয়ার সময় রাসূল (সাঃ)এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তারা রাসূল (সাঃ)এর সাথে সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন একটি কাতারে এবং তাদের সামনে সারা পৃথিবী ছিল আরেকটি কাতারে।তারা

উপলব্ধিই করতে পারেননি যে,তাদের বেছে নেয়া বিষয়টি নিয়ে তারা বিপাকে আছেন বরং তাদের বেছে নেয়া বিষয়টি ছিল পুরোপুরি দৃঢ় বিশ্বাসভিত্তিক।দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোপুরি স্পষ্ট।সারা দুনিয়াকে হারিয়ে ফেললেও তারা ছিলেন আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (সাঃ)এর সাথে।এজন্য ঈমানের জোরের ফলশ্রুতিতে তারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।তারা তার উপর ঈমান এনেছেন,তাকে সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তাকে অনুসরণ করেছেন। সে ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের অন্তরে প্রোথিত ছিল দৃঢ় বিশ্বাস।তারা বিশ্বাস করছেন তারা তার সাথে যে পথ চলছেন তাতে সারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দকে হারিয়ে ফেললেও সেটার সর্বশেষ গন্তব্য হচ্ছে- জান্নাত।

আমরা কি ধরে নেব যে এরা তাদের ঈমান এবং ভালোলাগার বিষয়টিতে পরিবর্তন এনেছে এবং রাসূল (সাঃ)এর গৃহীত ওয়াদা ও অঙ্গীকারকে ভংগ করেছে দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের কারণে?

এসকল লোকেরা নিজ চোখে যা দেখতেন,তাদের পঞ্চ ইন্দ্রেয় যা অনুভব করে তার চেয়ে রাসূল (সাঃ)যা বলেন তাতে বেশি বিশ্বাস করেন।তাদেরকে যখন বলা হল মুহাম্মাদ (সাঃ)মনে করেন তিনি রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে আবার একই রাত্রে ফিরে এসেছেন।তখন তারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই বললেন:যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে অবশ্যই সত্য বলেছেন।(৯৩)

এতকিছুর পরেও যদি বলা হয় তারা চুক্তি করেছেন এবং একটা অঙ্গিকার গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে তারপর তারা সেটাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সেটাকে ভঙ্গ করেছেন? অথচ,এরা তার প্রতি ঈমান আনা এবং তার ওয়াদা দেয়া বিষয়ের উপর বিশ্বাস করতে গিয়ে সমগ্র পৃথিবী থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

তারপর লক্ষ্য করুন রাসূল (সাঃ)পরবর্তী সময়ে তাদের যুদ্ধের দিকে।বিশেষ করে রিদ্দার যুদ্ধে লড়াই করে নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারকে পর্যদুস্ত করার সময়টি। তারা তৃষ্ণার্তের মত মৃত্যুর দিকে ছুটে গিয়েছিলেন।তারা মনে করেছিলেন রাসূল (সাঃ)এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি হয়ত এখানেই পূর্ণতা পাবে।মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা কাফন পরে সুগন্ধি লাগিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাতের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন।আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর আনীত দ্বীন এবং রিসালাত যেন টিকে থাকে এটাই ছিল উদ্দেশ্য।তাদের মধ্যে কিছু

লোক শাহাদাত বরণ করলেন।তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কুরআনের হাফিজ।আমরা কি এটা কল্পনা করতে পারি যে যেসকল সাহাবীরা শাহাদাতের দিকে এগিয়ে গেলেন তারা বিশ্বাস করতেন যে,তারা এমন একজন খলীফার অধীনে যুদ্ধ করছেন যিনি অন্যের হককে ছিনিয়ে নিয়েছেন,অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন এবং রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন?

২৫.কল্পনা করুন!রাসূল (সাঃ)এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করলেন তারা আল্লাহর পথে প্রচুর অত্যাচার নির্যাতন এবং পরীক্ষার শিকার হয়েছিলেন। তারপর নিজেদের দেশ ছেড়ে হিজরত করে চলে যেতে হলো অন্যত্র। ধনসম্পদ হারালেন। রাসূল (সাঃ)এর সাথে অন্য একটি দেশে চলে গেলেন যেখানে তাদের নেই কোন ঘর কিংবা ধনসম্পদ। হিজরত ছিল অজানার দিকে। যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাদের দেয়া ওয়াদার প্রতি আস্থাশীল তারা না হতেন তাহলে তারা কি এসব দুনিয়াবী আশার পিছনে ছুটতেন?
তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)এর জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করেছেন।এটা কি ভাবা যায় যে তারা রাসূল (সাঃ)এর সাথে এ পথ মাড়িয়ে,তাকে নিজেদের চর্ম চক্ষুতে অবলোকন করে,তার উপর আসা ওয়াহী দেখে এবং তাদের চোখের সামনে থাকা জীবন্ত কথা বলা মুজিজা দেখে জীবনের শেষ মুহুর্তে এসে দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থের কারণে আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)এর পথ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিবেন?

২৬.বিখ্যাত সাহাবী আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ);তিনি তার পিতা এবং মাতাসহ ইসলাম আগমনের একেবারে প্রাক্কালে রাসূল (সাঃ)এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন।তারা ছিলেন ধৈর্য ও অবিচলতার উপর দন্ডায়মান।প্রতাপশালী ও অহংকারী কুরাইশ নেতাদের সামনে তারা ছিলেন অত্যন্ত দূর্বল।মক্কার প্রচন্ড গরমে তাদের উপর চালানো হত প্রচন্ড অত্যাচার ও নির্যাতন।তাদের গৃহীত দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে অগ্নি পরীক্ষায় ফেলে দেয়া হত।মক্কার পাহাড়গুলো টলে গেলেও তারা টলতেন না।ইয়াসির (রাঃ)অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন এবং সুমাইয়া (রাঃ)শাহাদাত বরণ করে ইসলামের প্রথম শাহীদ হিসেবে গণ্য হলেন।রাসূল (সাঃ)তাদেরকে দুনিয়াবী কোন ভোগ বিলাশের ব্যাপারে ওয়াদা

দেননি।তিনি ওয়াদা দিয়েছেন সে নিয়ামাতের যার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাদের অন্তরকে পূর্ণ করে ফেলেছিল।রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন,

صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة

অর্থাৎ,হে ইয়াসিরের বংশধর!ধৈর্য ধরো।তোমাদের জায়গা হচ্ছে জান্নাত।(৯৪)
তারপর আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)বেঁচে ছিলেন এবং রাসূল (সাঃ)এর সাথে তিনি হিজরত করেছেন।রাসূল (সাঃ)তাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন যে,তিনি ফিতনার সময়েও তিনি সত্যের পথে অবিচল থাকবেন।এবং তিনি "শাহীদুল বাগী" তথা "সীমালংঘনকারীদের হাতে শাহীদ" হবেন।(৯৫)
আলী (রাঃ)কে যখন খালীফা হিসেবে বায়আত করা হল তখন তিনি তার সাথে ছিলেন এবং যখন তিনি যুদ্ধ করলেন তখনও বার্ধক্য বয়সে তিনি তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৯৪ বছরের কাছাকাছি। বার্ধক্য বয়সের কারণে যুদ্ধাস্ত্র ধরলে তা তার হাতে কাঁপতে থাকত। তিনি আলী (রাঃ)এর সাথে যুদ্ধ করার সময় বলছিলেন,আল্লাহর কসম!আমি এ পতাকা নিয়ে রাসূল (সাঃ)এর সাথে থেকে তিনবার যুদ্ধ করেছি এবং এটা চতুর্থবার। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তারা যদি আমাদেরকে আক্রমণ করে এমনকি আমাদেরকে সাফাতের হাজারের কাছেও পৌছে দেয় তাহলে আমরা জানতে পারব যে,আমাদের শান্তিকামীরা সত্যের উপর আছেন এবং তারা ভ্রান্তির উপরে রয়েছে।(৯৬)
আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে লোকটির এত উঁচুমানের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং আলী (রাঃ)এর প্রতি যার রয়েছে অনেক ভালোবাসা রাসূল (সাঃ)কর্তৃক কোন প্রকার অঙ্গিকার কিংবা চুক্তি গ্রহণের ব্যাপার তিনি দেখে থাকলে,সেটার ব্যাপারে স্বাক্ষী থাকলে এবং সেটাকে স্বীকার করে নিলে কি আলী (রাঃ)ছাড়া অন্য কারো হাতে বায়আত গ্রহণ কিংবা অনুসরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হত?
যদি ওয়াদা কিংবা অঙ্গিকার থেকেই থাকত তাহলে কি আম্মার (রাঃ)এতটাই অক্ষম ছিলেন যে তিনি আবু বকর ,উমর এবং উসমান (রাঃ)কে বলতে পারতেন না যে,আপনারা এমন একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যার হকদার আপনারা নন এবং আপনারা রাসূল (সাঃ)এর সাথে আমাদের কৃত অঙ্গিকার এবং ওয়াদাকে ভঙ্গ করছেন।

কি এমন জিনিস যা আম্মার (রাঃ)কে ভীতু বানিয়ে ফেলল? অথচ,তিনি এবং তার পিতামাতা প্রচুর অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন এবং তার পিতামাতা অত্যাচারের স্টীম রোলার সহ্য করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন।
যদি বাস্তবে কোন ওয়াদা কিংবা অঙ্গীকারের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে কিসে আম্মার (রাঃ)কে ভয় দেখালো যে,আলী (রাঃ)এর কাছে বায়আত গ্রহণ করে তার অনুগত হয়ে তিনি বার্ধক্য বয়স এবং শারীরিক শক্তির দিক থেকে দুর্বলতা নিয়ে মৃত্যুর দিকে ঝাপিয়ে পড়লেন অথচ,আরও বেশী অনুগত হওয়া দরকার যেখানে সেই রাসূল (সাঃ)এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে তার অনুগত হয়ে তার সাথে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার পুরণেই তো তার অগ্রগামী হওয়ার কথা ছিল।

২৭.হাসান বিন আলী (রাঃ)তার পিতামাতার সাথে গাদীরে খুম্মের ঘটনার ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি যথেষ্ট বুঝমানও ছিলেন।তার পিতামাতা রাসূল (সাঃ)এর সাথে হজ্জ্ব করেছেন।গাদীরে রাসূল (সাঃ)ভাষণ দেয়ার সময় তিনি তার পিতার কাছেই ছিলেন বলে মনে করি।তিনি তার পিতার হাতকে রাসূল (সাঃ)এর হাতের উপরে দেখেছেন এবং রাসূল (সাঃ)কি বলেছেন তাও শুনেছেন এবং আয়ত্ব করে নিয়েছেন।তখন তার বয়স ছিল আট বছর। তারপর তার হাতে খিলাফাতের দায়িত্ব গিয়েছে এবং তা তার অধীনে ছিল ছয়মাস পর্যন্ত।তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুসলিমদের মধ্যে শান্তি আনয়নের জন্য এবং দেশের স্থিতিশিলতাকে রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের বৃহত্তর শান্তির লক্ষ্যে তার অধিকারকে ছেড়ে দিলেন মুয়াবিয়া (রাঃ)এর হাতে।এটা কি বাস্তবে ধারণা করা যায় যে,তিনি সে ঘটনার সময়ে উপস্থিত থেকে সে নির্দেশনা শুনেছেন এবং আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর জন্য সেটা থেকে দূরে সরে গেছেন?
হাসান (রাঃ)এর জন্য অন্য যেকোন অপমান এর চেয়েও বেশী কঠিন।এ ওয়াদা ও অঙ্গীকার থেকে মানুষেরা সরে গেছে বলে দোষারোপ কে করবে? যার ব্যাপারে অঙ্গীকার করা হয়েছে তিনিই তো এটা থেকে দূরে সরে গেছেন।আফসোস তাদের জন্য!!আফসোস তাদের জন্য!
তারপর ওটাকে উসমান (রাঃ)এর সাথে তুলনা করুন যখন তার কাছ থেকে খিলাফাতের জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল।সেটা না ছিল রাসূল (সাঃ)এর পক্ষ

থেকে কোন ওয়াদা আর না ছিল তার পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে বরং সেটা ছিল মুসলিমদের পরামর্শ ও সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে।তারপর যখন তাকে তার বাড়ীতে অবরোধ করে তাকে খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার দাবি জানানো হল।তখন সেটাকে আকড়ে ধরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন মুসলিমদের বায়আত ও চুক্তির সম্মান রক্ষার্থে।

আপনি কি মনে করেন রাসূল (সাঃ)এরনাতি হাসান,তার মা রাসূল (সাঃ)এর কলিজার টুকরা ফাতিমা (রাঃ)এবং তার পিতা রাসূল (সাঃ)এবং সকল মুসলিম নরনারীর বন্ধু আলী (রাঃ)রাসূল (সাঃ)এরসাথে প্রদত্ত চুক্তি এবং অঙ্গীকারকে অগ্রাহ্য করে অন্যকে দিয়ে দেবেন অথচ,সেটা রাসূল (সাঃ)এর পক্ষ থেকে তার পিতার প্রতি ছিল নির্দেশনা?

২৮.এখানে দুটি পক্ষ রয়েছে যাদের কাউকে পক্ষপাতদূষ্ট কিংবা ওয়াদা ভঙ্গকারী বলা যায় না।তারা ছিলেন উম্মাহাতুল মুমীনীনগণ।তাদের আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যকার যেকোন একটিকে বেছে নিতে বলেছিলেন।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)﴾

অর্থাৎ,হে নবী (সাঃ)! আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন,যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও,তাহলে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ,তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং আখিরাতের প্রত্যাশী হও,তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (সূরা আল আহযাব:২৮-২৯)

তারা বিষয়টি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হননি।কোন প্রকার ইতস্ততঃ করেননি বরং তারা সবাই আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূল (সাঃ)ও আখিরাতকে বেছে নিয়েছিলেন।অত্যন্ত সীমিত পরিসরে দুনিয়াবী নিয়ামাতের মধ্যে থাকলেও তারা অল্পে তুষ্ট থেকেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার পরে তাদেরকে রাসূল (রাঃ)এর জন্য নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন এবং

তাদেরকে তার জন্য নির্দিষ্ট করে সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।এছাড়াও তার জন্য স্ত্রী হিসেবে শুধুমাত্র তাদেরকেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بعدَ ولَا أَنْ تبدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ولَو أَعْجبكَ حسنُهنَّ ﴾

অর্থাৎ,এরপর আপনার জন্য অন্য নারীরা হালাল নয় এবং এদের জায়গায় অন্য স্ত্রীদেরকে আনবেন এ অনুমতিও নেই, তাদের সৌন্দর্য আপনাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন।(সূরা আল আহযাব:৫২)

রাসূল (সাঃ)তাদের মধ্য থেকে কাউকেই আর পরিবর্তন করেননি এবং তাদের কারো থেকে দূরে সরে যাননি।

তিনি তাদেরকে বসিয়ে দিয়েছেন কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগন্তুক সকল মুমিনদের মাতার আসনে।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتُهُم ﴾

অর্থাৎ, নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের তুলনায় অগ্রাধিকারী,আর নবীদের স্ত্রীগণ তাদের মা। (সূরা আল আহযাব: ৬)

রাসূল (সাঃ)এর পরে অন্য সবার জন্য তাদেরকে বিবাহ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ الله ولَا أَنْ تَنْكحوا أَزْواجه مِنْ بعْده أَبدًا﴾

অর্থাৎ, তোমাদের কারো জন্য রাসূল (সাঃ)কে কষ্ট দেয়া শোভনীয় হবে না এবং তারপরে কখনো তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয়। (সূরা আল আহযাব:৫৩)

অতএব,বুঝা গেল তারা সবাই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গাতেই রাসূল (সাঃ)এর স্ত্রী। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করুন।

রাসূল (সাঃ)এর স্ত্রীরা ছিলেন বিভিন্ন গোত্রের মধ্য থেকে।কেউ ছিলেন কুরাইশ বংশের,কেউ বানু মুস্তালিক্ব থেকে:জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস,কেউ ইসরাইলী নাদ্বিরিয়া থেকে:সাফিয়া বিনতু হুয়াই বিন আখতাব,কেউ আবার হেলালিয়া থেকে:মায়মুনা বিনতুল হারিস।

তারপর কুরাইশদের মধ্য থেকে যারা ছিলেন তারাও ছিলেন এটার বিভিন্ন শাখা থেকে।তন্মধ্যে কেউ ছিলেন তাইমিয়া থেকে,কেউ ছিলেন আদায়ীয়া থেকে,কেউ ছিলেন মাখজুমিয়া,আমিরিয়্যাহ,আসাদিয়্যাহ এবং উমায়িয়্যাহ শাখা থেকে।

রাসূল (সাঃ)এর সকল স্ত্রী বিদায় হজ্জের সময়ে তার সাথে ছিলেন।মানুষেরা গাদীরে খুম্মে যা শুনেছে তারাও তাই শুনেছেন।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং তাদের পবিত্রতার স্বাক্ষ্য দিয়েছেন ফলে,স্বাক্ষ্য গোপন করার মত গর্হিত কাজ তাদের কাছ থেকে ঘটে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনাও করা যাবে না।আর তারা অঙ্গীকার ও ওয়াদা ভঙ্গের মত কাজে কস্মিনকালেও রাজী হবেন না।
যদি এমন কোন অঙ্গীকার ও ওয়াদা আদান প্রদানের ঘটনা ঘটেই থাকত তাহলে উম্মাহাতুল মুমিনীনরা যখন দেখতেন রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশের ব্যত্যয় ঘটানো হচ্ছে,তার কাছে দেয়া অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করা হচ্ছে অথচ তারা সেটার বিরুদ্ধে রুখেই যদি না দাড়াতেন এবং এ বিষয়ে যদি তাদের কোন অবস্থান না থাকত তাহলে,তারা কেমন করে দুনিয়া ও এর মধ্যকার সকল সৌন্দর্যকে দূরে ছুড়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূল (সাঃ)কে নিজেদের অগ্রাধিকার পছন্দ বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন?
তারা বিভিন্ন গোত্র ও বংশীয় হওয়ার কারণে আলী (রাঃ)এর বিরুদ্ধে গিয়ে নির্দিষ্ট কোন পক্ষের সাথে সকলেই এক জোট হয়েছেন এ অপবাদ দেয়া সম্ভব নয়।

২৯.গাদীরে খুম্মের ঘটনা এবং রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকাল ও আবু বকর (রাঃ)এর খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যকার সময়কাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত মাত্র ৮৪ দিন।যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা কেউই অনুপস্থিত ছিলেন না।যাদের সেটা মনে থাকার কথা তারা সেটা ভুলে যাননি।পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি যে কারণে এটা বলা যায় যে,তখনকার পরিস্থিতি ছিল এক রকম এবং আমাদের এখনকার পরিস্থিতি অন্য রকম।কারণ,সময়কাল ছিল খুবই কাছাকাছি।
এটা কিভাবে সম্ভব যে,বিশাল জনগোষ্ঠী সে সময়ে উপস্থিত থেকে রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশ এবং অঙ্গীকারের স্বাক্ষী থাকা সত্ত্বেও অল্প কিছুদিন পরেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন এবং নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটাবেন এবং কেউ তার কোন প্রতিবাদও করবেন না কিংবা বাধা হয়ে দাড়াবেন না এমনকি বাস্তবতা দেখে আজব হয়ে প্রশ্নও তুলবেন না।
যে প্রজন্ম রাসূল (সাঃ)কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন,তার পদাঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুকরণ করতেন এবং অন্তরে তাকে লালন করতেন সে জাতি এমন কাজ করতে পারে এটা কি মেনে নেয়া যায় কিংবা কল্পনা করা যায়?

৩০.আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)এর দাওয়াতী প্রকল্প সম্পন্ন হওয়া এবং পৃথিবীতে তার বার্তা পৌছে দেয়ার দায়িত্ব শেষ হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে সূরা নাসর নাজিল করেছেন।জানিয়েছেন যখন সেটার আলামতগুলো পাওয়া যাবে তখন সেটা তাকে মহান বন্ধুর সান্যিধ্যের জন্য প্রস্তুত করবে।আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)﴾

অর্থাৎ,যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং বিজয় লাভ হবে এবং আপনি দেখবেন যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করছে তখন আপনি আপনার রবের হামদ সহকারে তাঁর পবিত্রতা জ্ঞাপন করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী। (সূরা আন নাসর:১-৩)

এটা দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত থাকা,তার পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা,মানুষের কাছে এটার গ্রহণযোগ্যতা এবং এতে তাদের প্রবেশ করার বিষয়ে সুসংবাদ।

কিন্তু,যদি ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা প্রকাশ্যে দেয়া সত্ত্বেও অন্তরে যদি গোপণ থাকে মুনাফেকী তাহলে সেটা কিভাবে সুসংবাদ হয়? তারা ইসলামে প্রবেশ করবে,বায়আত তথা শপথ নেবে,অঙ্গীকার করবে তারপর রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকালের দিনে সবচেয়ে বড় চুক্তি ও অঙ্গীকারকেই ভঙ্গ করবে এটা কিভাবে সম্ভব?

আল্লাহ তায়ালা কি তাকে এমন সুসংবাদ দিবেন যে মানুষেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং এজন্য তাকে তাসবীহ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায়েরও নির্দেশ দিবেন আর সেসব লোকেরাই তার দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে এবং তার ইন্তেকালের দিনে তার নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবে?

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সেটা কেমন সুসংবাদ এবং এ দ্বীনের বিজয় হতে পারে? যেসব সাহাবীর হাতে বিজয় সাধিত হল,তারা তার সাথে অঙ্গীকার করবে,তাকে ওয়াদা দেবে তারপর আবার তার ইন্তেকালের পর তাকে দাফন করার আগেই তার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে? তাহলে তাদের অনুসারী এবং তাদের পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের অবস্থা কেমন হবে?

কত শত সংগ্রাম,দাওয়াত,অগ্নি পরীক্ষা ইত্যাদির পরে রাসূল (সাঃ)এর জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত এ সুসংবাদের শেষ পরিণতি এটা হবে তা কি ভাবা যায়?

না।বরং বাস্তবতা এর উল্টাটা।এটা হচ্ছে দ্বীনের চিরস্থায়ী হওয়া এবং তার বার্তা রাত ও দিন যতদিন চলমান থাকবে ততদিন সেটিও স্থায়ী হবে এটা তারই সুসংবাদ।মুহাম্মাদ (সাঃ)এর দাওয়াতী দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তার আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের সময় সন্নীকটে এসেছে।রাসূল (সাঃ)চলে যাবেন।তার বার্তা থেকে যাবে।দায়ী ইন্তেকাল করবেন এবং দাওয়াত থেকে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এটিই বলেছেন কুরআনের আয়াতে।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

অর্থাৎ,তিনি তার রাসূল (সাঃ)কে সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন তার দ্বীনকে অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার উপরে বিজয়ী করতে।তাকে মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা আত তাওবা: ৩৩)

অর্থাৎ,দ্বীন যদি রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকালের দিনে তাকে গোসল করানো,কাফন পরানো এবং তাকে দাফন করার আগেই নিভে যায় এবং সবচেয়ে বড় ওয়াদা ও চুক্তিটি ভঙ্গ করা হয় তাহলে সে দ্বীন এবং রাসূল (সাঃ)এর বার্তা কিভাবে বিজয়ীর ভুমিকায় থাকল? এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিজয়ীর ভূমিকায় থাকা কিংবা কুরআনী সুসংবাদ হিসেবে গণ্য হতেই পারেনা।বরং,সেটা ছিল দ্বীনের স্থায়ীত্ব এবং রিসালাত স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ;যেমনটি রাসূল (সাঃ)পৌছে দিয়েছেন,দায়িত্ব পালন করেছেন,বায়আত করেছেন এবং চুক্তি করেছেন।

৩১.আমরা যখন রাসূল (সাঃ)এর দাওয়াতের ইতিহাস ও তার অর্জন তুলে ধরি তখন সেটাকে মানব ইতিহাসের বিশাল অর্জন বলে বিবৃত করে থাকি।বলি স্বল্প সময়ে রাসূল (সাঃ)মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে স্থানান্তর করেছেন।তাদেরকে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন।তার পাশে একদল আদর্শ মানুষকে লালনপালন করে বড় করে তুলেছেন যা ইতিহাসে বারবার ঘটে না।যারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন,তাকে অনুসরণ করেছেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তারাই সত্যিকারভাবে মুসলিম।তিনি তাদের কাছে নিজেদের পিতামাতার চেয়েও বেশী

প্রিয়পাত্র ছিলেন।এজন্য রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকালের পরপরই আরব উপদ্বীপের কিছু অঞ্চলে ইসলাম ত্যাগের আন্দোলনগুলো খুব দ্রুতই নিভে গিয়েছিল।কারণ সেটার পরিধি ছিল খুবই ছোট এবং সীমাবদ্ধ।তারপর তার সাহাবীগণ তার রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে দিগ্বিদিক ছুটে গেলেন।মানুষের কাছে তার পৌছে দেয়া দ্বীনটাকে পৌছে দেয়া শুরু করলেন।পুরো পৃথিবীতে সে বার্তাটাকে পৌছে দিলেন যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রেরণ করেছেন।

বর্তমানে আমরা যখনই আযানে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলূল্লাহ" শুনি তখন আমাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়।সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে,সর্বত্র এটা ঘোষণা দিয়ে যায় এবং আমরা বলি-আল্লাহর পক্ষ থেকে কতই না সম্মান এ মহান নবীর!! তিনি বলেছেনঃ

﴿ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾

অর্থাৎ,আর আমি আপনার স্মরণকে উচ্চকিত করে দিয়েছি।(সুরা ইনশিরাহ:৪)

কিন্তু, "গাদীরের ঘটনার ক্ষেত্রে এটা ছিল নির্দেশনা এবং খলীফা হিসেবে গ্রহণের বিষয়। পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গড়িয়েছে তাতে সেটা হচ্ছে ওয়াদা ভঙ্গ,বিরোধীতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা। এগুলো প্রমাণ করে দেয় রাসূল (সাঃ)কে যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন সেটা হয়েছিল ব্যর্থ। ফলপ্রসু হয়নি। সেটা তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। অতএব,ইসলামের প্রথমদিকে যেসব লোকেরা এ রাসূলের উপর ঈমান এনেছেন এবং অন্যদের ঈমান আনয়নের কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন,নবূওয়্যাতের দীর্ঘ্য সফরে যারা তার পাশেই ছিলেন,তার সাথে হিজরত করেছেন এবং তার ও তাদের নিজেদের জীবনের শেষে এসে একত্রে তার সাথে হজ্জ্ব করেছেন এবং তার সাথে এ ওয়াদা ও এ অঙ্গীকার করেছেন সেই লোকেরাই ওয়াদা খেলাফ করলেন,অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন। নিজেদের ঈমানকে প্রকাশ করলেও তাদের পিছনে মুনাফেকী গোপন ছিল এর অর্থ হলঃ তার অর্জন ছিল এমন যে,কিছু সংখ্যক মুনাফিকের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপকে তিনি লালন করেছেন,শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে গড়ে তুলেছেন এবং তারা তার মৃত্যুর পর তারই সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি ইন্তেকাল করার পর তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে রূপ লাভ করেছে। আর তারা রাসূল (সাঃ)এর কাছ থেকে মুজিজাসহ যা কিছু দেখেছেন তা তাদেরকে তার রিসালাতকে সত্য বলে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট

পরিমাণ সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সন্তুষ্ট করতে পারেনি তার নির্দেশ প্রতিপালন কিংবা তার দ্বীনের অনুগত থাকার ক্ষেত্রে। এ বিষয়টি উম্মতের সাথে ধৈর্য,দাওয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষাদানের মাধ্যমে কাটিয়ে দেয়া সময়কালের বিকৃত চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে"!

যদি বাস্তবতা এমনি হতো তাহলে একজন ব্যক্তি কিভাবে রাসূল (সাঃ)এর পরবর্তী যুগ পরম্পরায় মানুষকে রাসূল (সাঃ)এর আনীত দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার সাহস করতে পারে? এ বিকৃত চিত্র এবং রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমরা মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিলে মানুষ আমাদের কি বলবে? আমরা তাদের কাছে এমন একটা বার্তা পৌছে দিলাম যার বাহক নিজের নিকটবর্তী লোকদেরকেই সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।আর যারা ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিলেন দেখা গেল তারা এসব দাবিতে সৎ ছিলেন না। তারা এ নবীকে ধোকা দিয়েছেন। তারা তার কাছ থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিলেন।এজন্যই তারা তার ইন্তেকালের দিনে তার সাথে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। যদি তারা বাস্তবেই তার নবুওয়াত ও বার্তার সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বাস করতেন তারা তার জীবিত ও মৃত উভয় সময়কালের ক্ষেত্রেই তার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বগুলো অক্ষরে অক্ষরে পুরণ করতেন।

তাদের উচিত শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিতঃ

صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الدعوية والتربوية وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية

গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা।

৩২.এ ঘটনাটি বলার অর্থ রাসূল (সাঃ)এরনামে এক ধরণের সরাসরি অপবাদ দেয়া যে,তিনি নিজের কাছের লোকদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হয়েছেন।অথচ,ইসলামের প্রাথমিক যুগে তারাই তার সাথে সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন।তারাই তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং মনের মধ্যে তারা বিশ্বাসঘাতকতা জিইয়ে রেখেছিলেন।এটা বাস্তবে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ)কে প্রদত্ত অপবাদ।যখন তারা বলেছিল,

﴿ هو أُذُنٌ ﴾

অর্থাৎ,তিনি যা শুনেন তাই বিশ্বাস করে নেন।

অর্থাৎ,তারা এর ব্যাখ্যা করেছিল কথাবার্তার মাধ্যমে ধোকা হিসেবে।এটার মাধ্যমে তাকে ধোকা দেয়া হয়।আল্লাহ্ তায়ালা এর জবাব দিয়ে বলেছেন,

﴿ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم﴾

অর্থাৎ,বলুন!তিনি ভালোটি শুনেন এবং বিশ্বাস করেন।(তাওবাহ:৬১)
এছাড়াও আমরা যখন রাসূল (সাঃ)এর জীবন অধ্যয়ন করি তখন আমরা দেখতে পাই- তিনি জীবনে কাউকে ধোকা দেননি এবং কেউ তাকে ধোকা দেয়নি।নিজের দূরদর্শীতার মাধ্যমে যে বিষয়টি রাসূল (সাঃ)জানতে পারেননি আল্লাহ তায়ালা ওয়াহীর মাধ্যমে তাকে সেটার ব্যাপারে অবহিত করেছেন।কোন ধোকাবাজ ব্যক্তি মানব সমাজকে পরিচালনা করতে পারেননা এবং বিশাল ও ঐতিহাসিক সফলতা অর্জন করতে পারেনা। তার কাছ থেকে ঠিকই ভন্ড ও ধোকাবাজরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়ে থাকে।তার কাছে তাদের উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়ে যায় এবং তাদের চক্রান্তের কোন কিছুই গোপণ থাকে না।

৩৩.আমি একজন শিয়া আলিমের কাছ থেকে যেসব কথা শুনেছি তন্মধ্যে সবচেয়ে ভালো কথাটি ছিলঃ আলী (রাঃ)এর নেতৃত্বের সময়কাল শুধুমাত্র তার খিলাফাতের সময়কালটুকুই ছিল না। বরং তিনি তার পূর্বেকার খালীফাদের খিলাফাতের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভুমিকায় ছিলেন।
এ কথাটি সত্য। এটির সত্যতা নিশ্চিত করে যে,আবু বকর (রাঃ)রিদ্দার যুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বে আলী (রাঃ)কে পাঠাননি। তাকে বিজয় অভিযানে পাঠাননি উমর (রাঃ)কিংবা উসমান (রাঃ)। তারা তাকে প্রেরণ করলে তার তরবারী কখনো লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হত না। বর্শা তার খাপের ভিতরে থেমে যেত না। কিন্তু,তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য তাকে মদীনাতে রেখে দেয়াকে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সেটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।তিনি তাদের কাছে থাকার অর্থ হল- তিনি নিজেই একটি নিয়ন্ত্রন কক্ষ এবং নেতৃত্বের প্ল্যাটফর্ম।এজন্য তার পূর্ববর্তী সকল খলীফার বিভিন্ন অর্জনে তিনি পরামর্শ এবং পরিচালনায় অংশীদার ছিলেন।
আলী (রাঃ)যেহেতু এ পর্যায়ে ছিলেন সেহেতু,তিনিই কি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে রাসূল (সাঃ)এর অঙ্গীকার ও নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তার নিজের মত প্রচার করে দিতেন না? যদি এমন কোন অঙ্গীকার কিংবা নির্দেশনার অস্তিত্ব থাকত

তাহলে,তিনি তাদেরকে তাদের প্রদত্ত অঙ্গীকার পুরণের কথা কি স্মরণ করিয়ে দিতেন না?

৩৪.এটা সর্বজনবিদিত যে,আলী (রাঃ)খালীফাদের কর্মকান্ড নজরে রাখতেন এবং তাদের কোন বিষয়ে নিজে দ্বিমত পোষণ করলে নিজের মতটিকে প্রকাশ করতেন।যেমন-

একজন পাগলীর রজমের ব্যাপারে তিনি উমর (রাঃ)এর সাথে দ্বিমত করেছিলেন।যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীসে এসেছে।তিনি বলেছেন,অমুক গোত্রের একটি পাগলীর পাশ দিয়ে আলী (রাঃ)অতিক্রম করছিলেন।তিনি ব্যভিচার করেছেন।উমর (রাঃ)তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।আলী (রাঃ)মহিলার কাছে ফিরে গেলেন এবং উমর (রাঃ)কে বললেন,হে আমীরুল মু'মিনীন!আপনি একে রজম করবেন? তিনি বললেন,হ্যাঁ।তিনি উত্তরে বললেন,আপনার কি মনে নেই যে,রাসূল (সাঃ)বলেছেন,

رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله، و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم

অর্থাৎ,তিন শ্রেনীর উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে:তারা হলেন মস্তিষ্কবিকৃত পাগল,ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং শিশু যতক্ষণ না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।তিনি বললেন,আপনি সত্য বলেছেন।অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন।(৯৭)

উমর (রাঃ)এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মত পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাইতেন যেখানে আলী (রাঃ)নেই।(৯৮)

তেমনিভাবে হাজ্জের সময়ে তামাত্তো করার বিষয়ে উসমান (রাঃ)এর সাথে আলী (রাঃ)এর মতভিন্নতার বিষয়টি লক্ষ্যনীয়।যেমনটি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রাঃ)এর বর্ণনাতে এসেছে।তিনি বলেন,আলী ও উসমান (রাঃ)উসফানে তামাত্তো করার বিষয়ে পরস্পর মতভিন্নতা করেছিলেন।উসমান (রাঃ)একত্রে কোন ব্যক্তির হজ্জ্ব ও উমরাহ করতে নিষেধ করতেন।অপরদিকে আলী (রাঃ)সেটা করার জন্য নির্দেশ দিতেন।উসমান (রাঃ)আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন-

উসমান (রাঃ):আপনি কি জানেন না আমি এটা করতে নিষেধ করি?

আলী (রাঃ):হ্যা জানি।

উসমান (রাঃ):আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও কি আপনি সেটা করবেন?

আলী (রাঃ):যে বিষয়টি রাসূল (সাঃ)করেছেন সেটার বিষয়ে আপনি কি করতে চান? আপনি সেটার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিবেন?
উসমান (রাঃ):আপনার থেকে আমাদেরকে রেহাই দেন।
আলী (রাঃ):আমি আপনাকে ছাড়তে পারব না।আমি রাসূল (সাঃ)কে উভয়ের জন্যই তালবিয়া পড়তে শুনেছি।আমি কোন মানুষের কারণে রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাতকে ত্যাগ করতে পারব না।
উসমান (রাঃ):হ্যাঁ ঠিক আছে।কিন্তু আমরা ভয় পেয়েছিলাম।
আলী (রাঃ)যখন এ মতের স্বপক্ষে ছিলেন তখন উভয়টিই একত্রে করেছিলেন।(৯৯)
দেখুন তার আলোকোজ্জ্বল উক্তি:আমি কোন মানুষের কারণে রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাতকে ত্যাগ করতে পারব না।
তাহলে এটা কি সম্ভব যে তিনি কোন ব্যক্তির পক্ষে রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশকে ছেড়ে দিবেন?
এটা কি কল্পনা করা যায় যে,তিনি এ বিষয়ে নিজের দ্বিমতকে জানান দিচ্ছেন অথচ,খিলাফাতের দায়িত্ব প্রদানের জন্য ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি তাদের মতের সামনে নিজের মতকে জানান দিবেন না? তার সাথে রয়েছে রাসূল (সাঃ)এর মুখ নিঃসৃত সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং অঙ্গীকার ও নির্দেশনা।ফলে তার পরবর্তী খলীফার বিষয়ে রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশনা থাকায় তিনি অন্য কেউ খলীফার দায়িত্ব নিক সেটা মেনে নিতে পারতেন না বরং তার সামনে বাধা হয়ে দাড়াতেন।
উপরোক্ত শাখাপ্রশাখাগত নির্দশনার বিপরীতে এ বিষয়টি আরও অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে এবং এ ধরণের কোন নির্দেশনা থাকলে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত হত!!

৩৫.আবু বকর (রাঃ)যখন খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন ফাতিমা (রাঃ)তার কাছে রাসূল (সাঃ)এর কাছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পাওয়া সম্পদের মধ্য থেকে রেখে যাওয়া সম্পদের মীরাস দাবি করলেন।আবু বকর (রাঃ)তাকে বললেন,রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ

لا نورث ما تركنا صدقة

অর্থাৎ,আমরা উত্তরাধিকারী বানাইনা।আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকাহ।

আবু বকর (রাঃ)তাঁর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে ফাতিমা (রাঃ)রেগে গিয়েছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) এর সাথে মৃত্যু পর্যন্ত আর সহজ হতে পারেননি। তিনি রাসুল (সাঃ)এর পরে আরো ছয়মাস বেঁচে ছিলেন।(১০০)

জান্নাতের নারীদের সর্দার ফাতিমা (রাঃ)নিজের হক বলে যেটা বিশ্বাস করতেন তা দাবি করতে কুন্ঠিত হননি। তিনি নিজের মতকে প্রকাশ করেছেন এবং আবু বকর (রাঃ)এর সাথে তার রাগান্বিত হওয়ার বিষয়টি বহুল প্রচারিত হল। বিষয়টি ছিল রাসূল (সাঃ)এর রেখে যাওয়া সম্পদে মীরাস। তার স্বামীর খিলাফাতের ব্যাপারে রাসূল এর ওয়াসিয়্যাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সেটা দাবি করা কি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না?

জান্নাতের নারীদের সর্দার ফাতিমা (রাঃ)তুচ্ছ মীরাসের ব্যাপারে যখন দাবি জানাতে পারলেন সেখানে কি তিনি তার স্বামীর নেতৃত্বের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশ বাস্তবায়নের দাবি করতে সক্ষম ছিলেন না?

৩৬.আলী (রাঃ)এর সাথে আবু বকর (রাঃ)এর সম্পর্ক ছিল ভালোবাসা,হৃদ্যতা ও সম্মানের সম্পর্ক।তার খিলাফাতের সময়ে একবার আসর নামাজের পর আলী (রাঃ)আবু বকর (রাঃ)এর সাথে মাসজিদ থেকে বের হয়েছিলেন।তারা দেখতে পেলেন বাচ্চাদের সাথে ইমাম হাসান (রাঃ)খেলা করছেন।আবু বকর (রাঃ)দৌড়ে তার কাছে গিয়ে তাকে কাধে উঠিয়ে নিলেন এবং আবৃত্তি করতে লাগলেনঃ

وا بأبي شبه النبي *** ليس شبيها بعلي

আলী (রাঃ)আবু বকর (রাঃ)এর কান্ড দেখে আনন্দের আতিশয্যে হাসছিলেন।(১০১)

আনন্দদায়ক এ সুন্দর পরিবেশের চেয়ে বেশী আনন্দঘন ও হৃদ্যতাপূর্ণ ও নৈকট্যপূর্ণ আর কোন পরিবেশ কি বাস্তবে পাওয়া সম্ভব?

তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্কের আরেকটি বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আলী (রাঃ)কর্তৃক তার এক ছেলের নাম আবু বকর (রাঃ)এর নামে রাখার মাধ্যমে।আবু বকর বিন আলী (রাঃ)পরবর্তীতে বেড়ে উঠেছেন এবং কারবালাতে তার ভাই হুসাইনের সাথে শাহাদাত বরণ করেছেন।(১০২)

আলী (রাঃ)কর্তৃক আবু বকর (রাঃ)এর বিধবা স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)কে বিবাহ করা (১০৩) এবং আবু বকর (রাঃ)এর সন্তান মুহাম্মাদ বিন আবু বকর কে তার কোলে-পিঠে লালন, পালন করা,তার সামনে তার বেড়ে ওঠা এবং তার সাথে সাহায্য-সহযোগিতা এবং ভালোবাসার সাথে বেড়ে ওঠার মধ্যেও এর প্রমাণ খুজে পাওয়া যায়।তিনি জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)এর সাথে ছিলেন।জামাল যুদ্ধের দিনে তিনি পদাচারীদের সাথে ছিলেন এবং আলী (রাঃ)তাকে মিশরের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তিনি যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তিনি তার জন্য অনেক চিন্তিত হয়ে বলেছিলেন,আমি তাকে সন্তান হিসেবেই মনে করতাম।তিনি ছিলেন ভাই এবং ভাতিজা।আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্য কল্যাণ কামনা করি।(১০৪)

আলী (রাঃ)এর সাথে উমর (রাঃ)এর মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং হৃদ্যতার আরও প্রমাণ ফুটে উঠে আলী (রাঃ)কর্তৃক তার ও ফাতিমা (রাঃ)এর কন্যা উম্মু কুলসুম (রাঃ)কে তার সাথে বিবাহ দেয়ার মাধ্যমে।(১০৫)

আসলে উমর (রাঃ)নিজেই আলী (রাঃ)এর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূল (সাঃ)এর পবিত্র বংশের সাথে নিকটাত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করা।তিনি বলেছেন,আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেছেন,কিয়ামাতের দিন সকল বংশ এবং কারণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে আমার বংশ এবং কারণ ব্যতিত।আর আমি চেয়েছি আমার এবং রাসূল (সাঃ)এর মাঝে বংশীয় এবং কারণগত সম্পর্ক থাকুক।(১০৬)

উম্মু কুলসুম (রাঃ)এর গর্ভে উমর (রাঃ)এর পক্ষ থেকে যায়েদ বিন উমার,রুক্বাইয়া বিনতে উমর (রাঃ)এর জন্ম হয় এবং যায়েদ (রাঃ)যুবক বয়সে তার মাতা উম্মু কুলসুমের সাথে একই দিনে ইন্তেকাল করেছেন।(১০৭)

আলী (রাঃ)এবং উমর (রাঃ)এর মধ্যকার হৃদ্যতার সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- আলী (রাঃ)তার একটি সন্তানের নাম রেখেছেন উমর আল ফারুক (রাঃ)এর নামে।তিনি উমর (রাঃ)এর খিলাফাতের সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং উমর (রাঃ)তার নাম রেখেছেন নিজের নামে এবং তাকে একজন গোলামকে দান করলেন যার নাম ছিল-মুওয়াররিক।আলী (রাঃ)এটাকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং এতে

সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।উমর বিন আলী (রাঃ)তার নাম ওয়ালিদ বিন আব্দিল মালিকের খিলাফাতের সময় পর্যন্ত বেচে ছিলেন।(১০৮)

উমর (রাঃ)ইন্তেকাল করার পর তাকে খাটের উপর রাখা হলে আলী (রাঃ)তার পাশে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন,আপনার চেয়ে আমার নিকট প্রিয় এমন কাউকে আমি রেখে যাইনি যার মত আমাল নিয়ে আমি আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করি।আল্লাহর কসম!আমি ধারণা করতাম আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সাথে রাখবেন এবং আমার মনে পড়ে আমি বহুবার রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি-আমি,আবু বকর ও উমর (রাঃ)গিয়েছি..., আমি আবু বকর ও উমর (রাঃ)প্রবেশ করেছি..., আমি আবু বকর ও উমর (রাঃ)বের হয়েছি...। (১০৯)

এ ধরণের হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকা কি আদৌ সম্ভব যদি তারা তার অধিকার লুন্ঠন করে নিতেন এবং রাসূল (সাঃ)এর সাথে তার ব্যাপারে দেয়া ওয়াদার ব্যাত্যয় ঘটাতেন?

৩৭.রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকালের সময়ে বানী হাশিমের লোকবল কম ছিল না। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব,তার সন্তান সন্ততি-ফাদল,কুসাম ও আব্দুল্লাহ,ছিলেন আকীল বিন আবি তালিব,আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দিল মুত্তালিব,নাওফাল বিন হারিস বিন আব্দিল মুত্তালিব,রাবী'আ বিন হারিস বিন আব্দিল মুত্তালিব ইত্যাদি।তেমনি ছিলেন তাদের চাচাদের বংশ বানী আব্দিল মুত্তালিব বিন আব্দি মানাফের লোকেরা যাদের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ

إنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد

অর্থাৎ,"নিশ্চয়ই বানু হাশিম এবং বানু আব্দিল মুত্তালিব একই জিনিস"। (১১০)গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি আলী (রাঃ)এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশকে আমলে নিয়ে কেন তারা যৌথভাবে ব্যাপারটি নিয়ে কোন প্রকার কথা বললেন না কিংবা বিরোধিতা করলেন না? কারণ,আমরা জানি তাদের মধ্যে আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন রয়েছে।

বানু হাশিম ও বানু আব্দিল মুত্তালিবের লোকদের মধ্যকার মুসলিম এবং কাফির সবাই গিরি গুহায় অবরোধের সময়ে রাসূল (সাঃ)এর সাথে ছিলেন।সেই লোকেরা

কি রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশনা এবং অঙ্গীকার থাকার পরেও আলী (রাঃ)এর পাশে থাকবেন না?

৩৮.সাইয়্যেদ রাশীদ রেজা তার তাফসীরে মানারে-

﴿يأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে,রাষ্ট্রনায়কের বিষয়টিতে যদি কুরআন কিংবা হাদীস থেকে সরাসরি কোন টেক্সট থাকত তাহলে সেটা মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনায় দেখা যেত এবং অনেক প্রসিদ্ধি অর্জন করত। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি যেটা হয়েছে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে।তাহলে রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকালের দিনে আলী (রাঃ) মুসলিমদের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে সে টেক্সটের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বক্তব্য দিতেন।তখনকার সময়ে যেভাবে সুন্দরভাবে তিনি বক্তব্য দিতে পারতেন সেভাবেই বক্তব্য দিতেন।তিনি যদি বিশ্বাস করতেন যে,রাসূল (সাঃ)এর ইন্তেকালের পর তিনিই রাষ্ট্রনায়ক হবেন তাহলে এটা করা তার জন্য ওয়াজিব হত।কেননা,সেটা আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূল (সাঃ)এর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল।

কিন্তু,তিনি সেটা বলেননি।কুরআনের আয়াত দিয়ে তিনি কিংবা তার পরিবারের কেউ অথবা যারা অন্যদের চেয়ে তাকে অগ্রাধিকার দেন তারাও প্রমাণ দাড় করাননি।না সাকীফার দিনে আর না উমর (রাঃ)এর পরে শুরা তথা পরামর্শসভার দিনে।না তার আগে আর না তার সময়কালে পরবর্তীতে।তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করতেন না।কথা কিংবা কাজে ছাড় দেয়ার বিষয়টি তিনি জানতেন না।এসব বিষয়ের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে,এসব বর্ণনা তৈরী করা হয়েছে এবং এসব দলীলাদি উদ্ভাবন করা হয়েছে দল উপদলে বিভক্ত হওয়া এবং দলগত কট্টরতা সৃষ্টির পরে।

খিলাফাতের ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাতের বিষয়টি আহলে কিতাবদের বাকবিতণ্ডার সাথে প্রাসঙ্গিক নয়।এটা এমন একটা বিষয় যার ব্যাপারে কুরআনের শব্দশৈলী সন্তুষ্ট নয়।রাসূল (সাঃ)তার পরবর্তী খলীফার ব্যাপারে মানুষকে জানাতে চাইলে বিদায় হজ্জের ভাষণেই সেটা মানুষকে জানিয়ে দিতেন।যেখানে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব

পৌছে দেয়ার ব্যাপারে মানুষকে সাক্ষী রেখেছেন এবং তারা সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আয়াতের পূর্বাপর বিষয় বাদ দিন। পৌঁছে দেয়ার কথা বলে আলী (রাঃ)এর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেয়ার বিষয়টি মানুষকে জানিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটা স্বয়ং আয়াতই স্বীকার করেনা।আয়াত থেকে প্রথমেই যে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়সেটা হল-এ নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রথম দিকে রিসালাতের সাধারণ বার্তা পৌছে দেয়ার নির্দেশনা।আয়াতটিকে বুঝার মানসিকতা নিয়ে অন্তর্চক্ষু দিয়ে বুঝার চেষ্টা করুন অন্যকে অন্ধ অনুকরণের চোখে নয়।

কিন্তু,হাদীস হল এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে আমরা জীবন গড়ার পথে সঠিক দিক নির্দেশনা পাই। আলী (রাঃ)এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পোষণ করি।যারা তাকে বন্ধু ভাবে তাদের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পোষণ করি। যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমরাও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি। সেটাকে আমরা রাসূল (সাঃ)এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করি।আমরা বিশ্বাস করি রাসূল (সাঃ)এরবংশীয় লোকেরা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত কুরআন থেকে দূরে সরে যাবেন না। কুরআন এবং তার বংশীয় লোকেরা রাসূল (সাঃ)এর প্রতিনিধি।গাদীরের ঘটনা ছাড়াই অন্যান্য বিভিন্ন সহীহ বর্ণনায় সেটার প্রমাণ রয়েছে। তারা কোন বিষয়ে একমত হলে আমরা সেটাকে অনুসরণ করব এবং তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করলে আমরা সেটাকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশনার দিকে নিয়ে যাব। (সংক্ষেপিত...(**১১১**)

৩৯.আমরা যদি ইতিহাসের উত্থান পতনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দৃঢ়ভাবে জানতে পারব যে,সৃষ্টির প্রতি এটা আল্লাহ তায়ালার অনেক অনুগ্রহ এবং তার নির্দেশনার ক্ষেত্রে অসাধারণ হিকমাতের বহিঃপ্রকাশ যে,রাসূল (সাঃ)তার পরবর্তী খলীফার ব্যাপারে কোন প্রকার নির্দেশনা দিয়ে যাননি।কেননা,রাজনীতি,রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করা দুনিয়াবী একটা বিষয় যাতে পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নটার কারণে গবেষণায় পরিবর্তন আসতে পারে।অতএব,রাসূল (সাঃ)নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর খালীফা হওয়ার বিষয়ে সরাসরি এবং সুস্পষ্টভাবে কিছু বলে যাননি। আবু বকর (রাঃ)খলীফার দায়িত্ব কাধে নিলেন অল্প পরিসরে

পরামর্শসভা তথা শুরার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।উমর (রাঃ)খালিফা হলেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে পরামর্শ করার পর তার পূর্ববর্তী খালীফা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার মাধ্যমে।উসমান (রাঃ)খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বৃহত্তর পরিসরে পরামর্শ সভা তথা শুরার সিদ্ধান্ত অনুসারে আর আলী (রাঃ)মানুষ কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।তার সময়ে মানুষেরা অন্য কাউকে নির্বাচিত করবে এমন কেউ ছিল না।ইমাম হাসান (রাঃ)খলীফার দায়িত্ব কাধে নেয়ার পর সেটাকে ছেড়ে দেন উম্মাতের বৃহত্তর কল্যানের কথা চিন্তা করে এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ)উম্মাতকে উদ্ধারের লক্ষ্য কাধে নিয়ে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

অল্প কয়েক বছর সময়ের মধ্যে খালীফাদেরকে নির্বাচন করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া এদিকেই ইঙ্গিত করে যে,প্রত্যেক যুগের জন্য তাদের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য।

ইসলামী শারীয়াত প্রণেতার হিকমাত এবং শারীয়াতের প্রশস্ততার একটি প্রমাণ হচ্ছে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের পদ্ধতির ব্যাপারটিতে কোন নির্দেশনা না দিয়ে সেটাকে মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল-সেটা নিয়ে মানুষের গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রণয়ের দরজা প্রশস্ত হবে,যা মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে এবং অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে মানানসই হবে।

গাদীরের ঘটনা এবং চিন্তা-ভাবনার আবশ্যকীয়তা

বিভিন্ন গল্প ও লোকমুখে প্রচলিত ঘটনাবলী যেভাবে কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই বর্ণনা করা হয় আমাদের ইতিহাসকেও সেভাবেই বর্ণনা করা সঠিক পদ্ধতি নয়, যে আমরা আমাদের ঘটনা ও বর্ণনা সমূহে জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগাবোনা, অথবা আমাদের বিশ্বাসের জায়গায় চিন্তার জগতকে রুদ্ধ করে রাখবো। বিশেষত প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ এর সাথে সম্পৃক্ত কোন কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, অথবা সায়্যিদুনা আলী আল-মুরতাজা এর ক্ষেত্রে [28]।

কেননা আমরা এ ধরনের যে সব বিষয় রিওয়াইয়াত করি তার সাথে আমাদের ঈমানী বিশ্বাস জড়িত, এবং দ্বীনী বিষয় সম্পৃক্ত যার জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবো, এবং সেগুলো আমাদের অন্তরে ভালোবাসা ও বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত করবে, আনুগত্য এবং শত্রুতার আবহ সৃষ্টি করবে, এবং আমাদের সাময়িক চলার পথকে আখিরাতের চিরস্থায়ী পথের দিকে পরিচালনা করবে।

অতএব মানুষের ঈমান, দ্বীন, এবং আল্লাহর দিকে চলার পথ তার আক্বল, জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার পথ থেকে দূরে থাকা কাম্য নয়। কেননা আক্বল হলো তাকলিফ (মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধি-নিষেধ অবতীর্ন হওয়ার) মূল ক্ষেত্র, আর তাফকির (চিন্তাভাবনা) হলো ইসলামী দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সবচেয়ে যে বিষয়ে জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে, এবং যেটি সবচেয়ে ফলপ্রসু ও ঝুকিপূর্ণ ক্ষেত্র তা হলোঃ মানুষের নিজের ধর্মীয় জীবনকে সংশোধন ও আল্লাহমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণকৃত সিদ্ধান্ত।

---

(28) এটা শুধু সায়্যিদুনা আলী (রাঃ) এর ক্ষেত্রে নয়, বরং সকল সাহাবায়ে কেরাম বা যে কোন বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রেই একজন মু'মিনের দায়িত্ব সেটির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, বা এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পূর্বাপর বিষয়গুলোও বিবৃত করা যাতে সংশ্লিষ্ট ঘটনার নেপথ্য কারণ, আসল অর্থ, উদ্দেশ্য সঠিকভাবে মানুষ বুঝতে পারে। অন্যথায় কারো মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যাই শুনবে যাচাই বাছাই ছাড়া তা বর্ণনা করে বেড়াবে, অথবা স্থান-কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য না রেখে বলা কথা বড় কোন ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়াও এটি কোন কল্যানের কথা নয় যে মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে কেবল জাগতিক বিষয়ে ব্যবহার করবে, কিন্তু দ্বীনী ও পরকালীন ব্যাপারে আক্বল ও চিন্তার দরজাকে বন্ধ করে রাখবে।

কোরআনে কারীমে যেভাবে জ্ঞান বুদ্ধির ব্যাবহারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং চিন্তা ও ফিকরের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এমনটি আর অন্য কোথাও করা হয়নি; কেননা চিন্তা ভাবনা এবং জ্ঞান ও বিবেকের সমন্বয় মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসে এবং তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ও সংশোধনের প্রতি একনিষ্ঠ করে তুলে, ঠিক যেমন ভাবে ইসলাম মানুষকে স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে বলে।

এটি এই জন্য যে দ্বীনে ইসলাম এমন কোন কিছু পালন করতে বলেনা বা নিয়ে আসেনি যা আক্বল ও বুদ্ধি বিবেক অসম্ভব বলে মনে করে বা এটি অস্বীকার করে। হ্যাঁ, এমন বিভিন্ন বিষয় এসেছে যেগুলোর ব্যাপ্তি বা হিকমাত আক্বল অনুধাবন করতে পারেনা, বুঝতে পারেনা -মনুষ্য জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে-, তবে আক্বলের নিকট অসম্ভবনীয় এমন কিছুর আদেশ দেয়নি। এ জন্য বলা হয়েছেঃ "শরীয়ত আক্বলকে ভাবনায় ফেলে দেয়ার মতো হুকুম নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু আক্বলের নিকট অসম্ভব এমন কিছু কখনো নিয়ে আসেনা"[29]।

---

(29) অর্থাৎ শরীয়ত এমন অনেক জিনিসের কথা বলেছে যা আক্বলকে চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য করে, কখনো কখনো হয়রান বা আশ্চর্যান্বিতও করে দেয়, তবে সেটি মানুষের জ্ঞানের সীমানার বাহিরের বা বোধগম্যতার উর্দ্ধের কিছু হওয়ার কারণে যা মানুষ তার সীমিত জ্ঞান, জগত সমূহ ও মাখলুকাত্বের বিশালতা এবং নিজের অতি ক্ষুদ্রতার জন্য বুঝতে পারেনা, কিন্তু এমন কিছুর কথা কখনো বলেনা যা আক্বলের নিকট অসম্ভব বা পরিপূর্ণরূপে বিপরীত ও সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা কোন জিনিষ বুঝতে না পারা আর সেটিকে সঠিক ভাবে চিন্তা ভাবনার পর অসম্ভব বলে মনে করা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। যেমন নামাজ, হজ্ব, রোযার সময়সূচি, যাকাত বা হুদুদের নেসাব, পরকালীন বিষয়াদী ইত্যাদি অনেক কিছু আমরা আকুল দিয়ে অনুধাবন করতে সক্ষম নই, এগুলো আল্লাহ তা'আলা কেন এই সময় করতে বলেছেন, বা এর প্রক্রিয়া কি হবে তা আমাদের বোধের অতীত, কিন্ত ১ + ১ মিলে ২ না হয়ে ৩ হবে এটি আক্বলী দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব, তাই আমরা শরীয়তে প্রথমটির অনেক নজীর পেলেও দ্বিতীয়টির কোন নজীর পাবোনা। যদি কেউ ইসলামী শরীয়তে এমন কিছুর দাবী করে তাহলে সেটি তার অপরিপক্ক আক্বল বা ঐ হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচায়ক হবে, যেমনটি আজকাল অনেকে বিভিন্ন আদর্শ, মতবাদ বা কৃষ্টি-কালচারের প্রভাবে করে থাকেন, জ্ঞানী ও আহলে ইলমদের নিকট থেকে জেনে সেসব প্রশ্ন ও সংশয়ের সমাধান করে নেওয়া ঈমান ও আক্বলের দাবী।

কোরআনে কারীমে আক্বলকে সম্মানের স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সে মোতাবেক আমল করা ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 32]

অর্থাৎঃ (পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্টতর। তোমরা কি বুঝ না?)। (সূরা আল- আন’আম- ৩২)
আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

[البقرة:269]

অর্থাৎঃ (তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়,সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। বস্তুত উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান)। (সূরা আল-বাক্বারাহ-২৬৯)
তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ

﴿ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 65]

অর্থাৎঃ (দেখ,আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝে নেয়)। (সূরা আল-‘আনআম- ৬৫)
আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা বলেনঃ

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴾ [محمد:24]

অর্থাৎঃ (তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?) (সূরা মুহাম্মাদ- ২৪)
এ সকল আয়াতে কারিমাহ ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত সমূহে আক্বল ও চিন্তা-ভাবনাকে ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় দায়ীত্ব হিসেবে নির্ণয় করা হয়েছে, এবং এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যে আক্বল কে ইসলাম সম্ভোধণ করে সেটি হলো এমন আক্বল যা বিবেককে সংরক্ষণ করে, কোন হুকুমের বাস্তবতা ও নেপথ্য হাকিক্বত অনুধাবন করতে পারে, বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য বুঝতে পারে, বিপরীত

বিষয় সমূহের মাঝে তুলনা করতে পারে, দূরদৃষ্টির অধিকারী, চিন্তা ভাবনা করতে সক্ষম, এবং মেধাবী ও বিচক্ষণ।[30] এবং এটি সেই আক্বল যার বিপরীত হলো কুপমুণ্ডকতা, একগুঁয়েমি, ও ভ্রষ্টতা। ঐ আক্বল এখানে উদ্দেশ্য নয় যার বিপরীতে বুঝ শক্তির অভাব, পাগলামি বা মানুসিক বৈকল্য ব্যবহারীত হয়।[31]

এখানে যে বিষয়টির প্রতি বারবার মনোনিবেশ করা উচিৎ তা হলো যে কোরআনে কারীমে আক্বলের বিবিধ বৈশিষ্টের প্রতি এভাবে গুরুত্বারোপ এবং বিভিন্ন ভাবে এর উল্ল্যেখ ঘটনাক্রমে, আকস্মিকভাবে বা শুধুই পুনরাবৃত্তির জন্য করা হয়নি, বরং এর উদ্দেশ্য হলো এমন একটি বিষয়ের প্রতি প্রর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা যা দ্বীনের মৌলিকত্ব ও সারমর্মের চাহিদা, যার অপেক্ষায় ছিলো প্রত্যেক ঐ মু'মিন ও মুসলিম ব্যক্তি যে এই ধর্মের মূল বিষয় বঝতে ও হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছে, এবং ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য কি তা অনুধাবন করতে পেরেছে।

বস্তুত আক্বল ও ফিকরকে বিকল করতে এবং মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবক ব্যাপারগুলোতে চিন্তা ভাবনার পথকে রুদ্ধ করতে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখে অপরের অন্ধ অনুসরণ এবং তাদেরকে আমাদের দ্বীন ও ঈমানের অভিভাবক বানানো।[32]

কেননা কখনো কখনো আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্পণ করি এমন ব্যক্তিবর্গের উপর যারা কোরআন-সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করা ছাড়াই পূর্বপুরুষ থেকে চলমান প্রথার উপর অটল থাকে, অথবা আমাদের ঘিরে থাকা আশেপাশের সমাজকে বানিয়ে ফেলি আমাদের ধর্মীয় অভিভাবক।

---

(30) এর অর্থ এটি নয় যে ইসলাম সাধারণ মানুষের জন্য নয়, শুধুমাত্র সমাজের অভিজাত কিছু মানুষের জন্য বুঝি অবতীর্ণ হয়েছে। না, বরং এর উদ্দেশ্য হলো ইসলাম প্রত্যেককে তার আক্বলের সাধ্য অনুযায়ী চিন্তা-ফিকরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যে চিন্তা তাকে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে, তাঁর পরিচয় লাভ করতে, তাঁর আয়মত ও কুদরত সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করবে, জগতের রহস্য জানতে উৎসাহিত করবে, শরীয়তের সৌন্দর্য বুঝতে সহায়তা করবে, ব্যক্তির আক্বল ও বুদ্ধির সীমা অনুযায়ী।

(31) কারণ সেটি একটি মানসিক রোগ যাতে ঐ ব্যক্তির ভূমিকা নেই, এবং এ কারণে পাগলকে শরীয়তের মুকাল্লাফও বানানো হয়নি।

(32) অর্থাৎ কোন রূপ চিন্তাভাবনা ছাড়া, কোরআন, সুন্নাহর বিপরীতে এমন কারো অন্ধ অনুকরণ করা যে ঈমান, আমলে, ধর্মীয় মাসআলায় উম্মাহর স্বীকৃত মুতাওয়ারাস পদ্ধতি, এবং সালাফে সালেহিনের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত ধারার চর্চা করে, পরিশেষে সে নিজেও ভ্রষ্টতার শিকার হয় এবং তার অনুসারীদেরকেও গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়।

অথচ ইসলামে মানুষ তার পূর্বপুরুষ, বাপ-দাদাদের উপর নিজের কর্মের ভার বা ওজর চাপিয়ে দেয়াকে খুবই দোষণীয় হিসেবে দেখা হয়ে থাকে, এবং যারা ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত পেলো এবং এই নে'য়ামতে ভূষিত হলো তাঁরা নিজেদের আক্বলকে চিন্তাভাবনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়াকে নিন্দার্হ বলে অভিহিত করেছে; কেননা তাঁরা তাঁদের পিতা ও পিতামহদের থেকে এমন আক্বিদা প্রাপ্য হয়েছে যার মাঝে তাঁর নিজস্ব আক্বল ও চিন্তা -ফিকরের কোন অবদান নেই।

এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170].

অর্থাৎঃ (আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে,সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন,তখন তারা বলে কখনো না,আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না,জানতো না সরল পথও)। (সূরা আল বাক্বারাহ-১৭০)

নিশ্চয় মানুষের জন্য তার পূর্বপুরুষদের প্রতি অনুগামী এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া একটি সাধারণ বিষয় ও কর্তব্যও বটে, তবে তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা আর অপরিনামদর্শি ভাবে তাঁদের গোমরাহি বা ভুলের অনুসরণ এক নয়। কেবল জ্ঞানীরাই সম্যক অবগত এ দুই অবস্থার পার্থক্য সম্পর্কে।

এবং মানুষ তার ঈমান-আক্বিদার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে কোনরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই নিজস্ব পরিমন্ডল ও বেষ্টিত সমাজের অনুসরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যদিও ব্যক্তি তার আশেপাশের সামাজিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জাগ্রত বিবেক, তীব্র ইচ্ছাশক্তি এবং সংগ্রাম করার সক্ষমতা প্রয়োজন, -কিন্তু যে এমন করতে পারে সেই হিদায়াতের নুর প্রাপ্ত হয়-।

কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69].

অর্থাৎঃ (যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে,আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব)। (সূরা আল আনকাবুত- ৬৯)
সংশ্লীষ্ট আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগানো সৃষ্টিকর্তার আদেশ, তাহলে মাখলুক্কের (মানুষের) জন্য তা থেকে বিরত থাকার কোন অবকাশ নেই, সেটি যে কারণেই হোক; যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য, অথবা ভয়ের কারণে, যদিও এই মাখলুক সুবিশাল জামা'আত হয় যারা আমাদেরকে ঘিরে আছে ও বেষ্টন করে আছে।([33])
কেননা যারা আমাদের শবদেহ বহন করে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে তাঁরা আমাদেরকে সেখানেই রেখে আসবে নিঃসঙ্গ স্বীয় কর্মফল ভোগ করার জন্য। পুণরুত্থান দিবসে প্রত্যেককে একাকীই উঠতে হবে, বন্ধু-স্বজন কেউ সেদিন সাথে থাকবেনা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿ وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا ﴾ [مريم: 95].

অর্থাৎঃ (কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে)। (সূরা মারইয়াম-৯৫)
আমাদের আশেপাশে দুনিয়াতে আজ যারা আছে তাদের কেউ থাকবেনা সঙ্গী হবেনা প্রভুর সমীপে একাকী পেশ হবার সময়। কালামে পাকে ইরশাদ হয়ঃ

﴿ وَلَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٖ ﴾ [الأنعام: 94].

অর্থাৎঃ (তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ আমি প্রথমবার তোমাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছিলাম)। (সূরা আল-আন'আম- ৯৪)
কেয়ামত দিবসে কেউ সাথী হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ﴾ [عبس: 37].

অর্থাৎঃ (সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে)। (সূরা আবাসা- ৩৭)
আজ প্রত্যেকে যারা আমাদের স্বপক্ষে লড়াই করছে সেদিন কেউ আমাদের পক্ষ হয়ে লড়বেনা। ইরশাদ হয়ঃ

---

(33) আব্বাস আল-আক্কাদ কর্তক রচিতঃ 'আল-তাফকিরঃ ফারিজাতুন ইসলামিয়্যাতুন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়ে উল্ল্যেখিত গ্রন্থের কিছু সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

﴿يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ تُجَٰدِلُ عَن نَّفۡسِهَا﴾ [النحل: 111].

অর্থাৎঃ (যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্ম-সমর্থনে সওয়াল জওয়াব করতে করতে আসবে)। (সূরা আল-নাহল- **১১১**)

আমরা -শেষ নবীর উম্মত হিসেবে- সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কেউ যতোই সম্মানীত হোক না কেন তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবোনা, একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের ব্যাপারেই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, অন্য কেউ নন। (এমনিভাবে পূর্ববর্তীরাও তাঁদের নবী রাসুলদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে)-যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ [القصص: 65].

অর্থাৎঃ (তোমরা রসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে?)। (সূরা আল-ক্বাসাস- ৬৫)

এমতাবস্থায় আমরা যে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো সেটির নিরঙ্কুশ সঠিক উত্তর পেতে জ্ঞান ও বুদ্ধির যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সাধ্য ব্যয় করার মুখাপেক্ষী নই কি?

একই সাথে হিদায়াতের শীতল জ্যোতির পরশ পেতে যে মহান স্বত্তা এর মালিক এবং যিনি বান্দাকে এই নেয়ামতে ভূষিত করেন তাঁর নিকট কায়মনোবাক্যে চেয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই, যে সুবাদে হয়তবা আমরা সৌভাগ্যবান ঐ দলের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবো যারা সেদিন জান্নাতের সিংহাসনে বসে বলবেঃ

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُۖ﴾ [الأعراف: 43].

অর্থাৎঃ (আল্লাহ শোকর,যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, হিদায়াত দান করেছেন। আমরা কখনও সঠিক পথ পেতাম না,যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন)। (সূরা আল- আ'রাফ- ৪৩)

হিদায়াতের এই অমূল্য সম্ভার পেতে প্রভুর সমীপে চাওয়া হতে হবে তেমনি আকুল ও উজাড় করা, প্রয়োজন সমর্পিত হৃদয়ের একনিষ্ঠ প্রার্থনা ও অবিচল পথচলা, তবেই তিনি দেখাবেন সে পথ, অন্তর্দৃষ্টিকে করবেন আলোকিত, হৃদয় পাবে তার সন্ধান।

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ ﴾ [الفاتحة: ٦]

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।

আপনার দয়ায় মতভেদপূর্ণ বিষয়ে হক্কের উপর রাখুন। একমাত্র আপনিই যাকে ইচ্ছা তাকে সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝٥٣ ﴾ [آل عمران: ٥٣]

অর্থাৎঃ (হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও)। (সূরা আলে ইমরান- ৫৩)

﴿ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ۝١٠ ﴾ [الحشر: ١٠]

অর্থাৎঃ (হে আমাদের পালনকর্তা,আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়)। (আল-হাশর- ১০)।

আমাদের দোয়ার পরিসমাপ্তি হলোঃ সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

❍❍❍

বই রচনার প্রেক্ষাপট

১- বক্ষমাণ বইয়ের প্রেক্ষাপট তৈরী হয় প্রিয় ভাই আবু হানি হামাদ আল-গাম্মাস এর সাথে কোন এক আলোচনার সময়, প্রায় বিশ বছর পূর্বে তিনি ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন। এরপর থেকে যতবারই আমি এই বিষয়ে ভেবেছি, অথবা এ সংক্রান্ত কোন গবেষণার কাজে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, বা আলোচনার সযোগ হয়েছে, অথবা কোন বন্ধুর সাথে কথা হয়েছে ততবারই এ সম্পর্কে কিছু করার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই সমষ্টি আজ আপনাদের হাতে।

২- উপর্যুক্ত ধারণাকে বাস্তবায়িত করার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষক ও আগ্রহী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, যা এর পরিধিকে প্রসারিত করেছে এবং বিষয়ের সীমারেখাকে স্পষ্ট করেছে। অতঃপর,কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে বইটি আমি উলামায়ে কেরামদের একটি জামাতের কাছে উপস্থাপন করেছি, এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং সংযোজনের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন, অপর ভাইয়ের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, কেননা ব্যক্তির একক অবস্থার চেয়ে সমষ্টিগত অবস্থার শক্তি সর্বদাই বেশী হয়।

৩- হাদিসের প্রেক্ষাপট বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বর্ণনাকে একই প্রেক্ষাপটে একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছি, যেমনটি আমি আমারঃ (''কা-আন্নাকা মা'আহু''/ কেমন যেন তুমি তাঁর সাথে) এবং (''কাসাসুন নাবাওয়িয়্যিয়াহ''/ নবী জীবনের ঘটনাবলি) গ্রন্থদ্বয়ে করেছি। যেখানে একটি নির্দিষ্ট নস্ব বা বর্ণনা যার সমষ্টিগত প্রেক্ষাপট, বাক্য আহরণ করা হয়েছে বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের সূত্র থেকে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উল্লিখিত পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য (''কা-আন্নাকা মা'আহু'') গ্রন্থে (''মা বা'দ আল-কিতাবাহ''/ লিখার পরবর্তী অবস্থা) অধ্যায় (১৬৩ নাম্বার পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

৪- আলোচ্য গ্রন্থে যথা সম্ভব সঠিক ও বিশুদ্ধ বর্ণনা বেছে নেয়ার চেষ্ঠা করেছি আমি, কখনো কখনো যদিও এমন কোন কোন বর্ণনার উল্ল্যেখ হয়েছে যার সনদ ও সূত্রে

কিছু দূর্বলতা আছে, তবে তা বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের সহযোগী হিসেবে যদি এর মূল মতন / টেক্সটে স্পষ্ট সমস্যা না থাকে। সেটি এই জন্য যে একটি ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনাকে একসূত্রে গাঁথার সময় সংশ্লিষ্ট সবকিছু নিয়ে আসলে এর মাধ্যমে সেগুলোতে থাকা দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা এবং ঘটনার সঠিক প্রতিপাদ্য থেকে তা আলাদা করা সহজ হয়। ঠিক যেমন ভাবে -কখনো কখনো- এই পদ্ধিতিতে ত্রুটিযুক্ত সনদে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়কে দূর্বল হিসেবে অবিহিত করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে উদ্দ্যেশ্য ও মর্মগত দিক থেকে সে ধরণের শাওয়াহিদ/ সমর্থন পাওয়া যাওয়ার কারণে, অথবা বিষয়ের নেপথ্য প্রেক্ষাপটের বাস্তবতায়, ইত্যাদি।

৫- আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সন্নিবেশিত করার ইচ্ছে করিনি যা আলোচনাকে গভীরতা ও ব্যাপকতার দিকে নিয়ে যেতো, তবে এ সংক্রান্ত হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনাকে একত্রিত করে ঘটনার পূর্বাপর অবস্থা ও প্রভাব সহ গল্পটি সম্পূর্ণ আকারে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ এবং আনুগত্য ও বন্ধুত্বের ঘোষণা সহ এমন ব্যক্তির জন্য যাকে ভালোবাসতে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বন্ধুত্ব রাখতে আমরা নির্দেশিত হয়েছি। আমাদের নেতা, নবীজী ও আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয়পাত্রঃ আমিরুল মু'মিনিন আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

এই গ্রন্থে তাই উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি একান্ত মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে, এছাড়াও ঘটনার মূল উদ্দেশ্য এবং চিন্তার স্বচ্ছতা, প্রেক্ষাপটের মসৃণতা ও যথাসম্ভব উক্তির সংক্ষিপ্ততার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন এবং আদেশ করেছেন এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবনে।

পরিশেষে আমাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে নিয়তের পরিশুদ্ধতা, বলার ক্ষেত্রে সততা এবং কর্মের ক্ষেত্রে সৎপরায়ণতা কামনা করছি। নিশ্চয়ই আমাদের পালনকর্তা যা চান তার প্রতি দয়াশীল, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❍❍❍

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আমি অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি সে সকল মাশায়েখ এবং বন্ধুবান্ধবের যারা এই বইয়ে নজর বুলিয়েছেন, এবং তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন, যার পরিক্রমায় এতে অনেক সংশোধনী এসেছে, সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে, এবং বর্তমান পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অতএব তাঁরাও এই কাজের অন্যতম অংশীদার। তাঁদের মাঝে উল্ল্যেখযোগ্য হলেনঃ

প্রিয় ভাই শায়খ হামাদ আল-গাম্মাস; যিনি প্রায় বিশ বছর পূর্বে এই গ্রন্থের বীজ বপন করেছিলেন আমার মনে, এবং সম্পূর্ণ হবার পর এটি নিরীক্ষণ করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যোগ করেছেন যা না হলে এতে অপূর্ণতার ছোঁয়া থেকে যেতো। অতএব তিনি এই গ্রন্থের নেপথ্য রচয়িতা গ্রন্থকারের পূর্বেই, এবং রচনা সমাপ্তির পর এতে পূর্ণতার রেশ প্রদানকারী। আমি তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি; যেহেতু তিনিই এদিকে পথ দেখিয়েছেন।

এবং শায়খ ড. আল-শরীফ হাতেম আল-আউনী; যিনি প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজনী প্রস্তাব করেছেন যা আমি সংশ্লিষ্ট স্থানে যোগ করেছি।

এবং আমার উস্তায শায়খ সালেহ আল-শামী, ড. আহমাদ আল-বারা আল-আমীরী, ড. খালেদ আল-বাহলালী, উস্তায হুসাইন বা-ফকীহ, ড. আবদুল্লাহ আল-সুবাইহ, ড. খালেদ আল-দারওয়ঈশ, শায়খ ইয়াসির আল-মাত্বরাফী, শায়খ খালেদ আল-ওয়াস্বাবী, ড. সামী আল-মাজেদ; সকলেই বিভিন্ন মন্তব্য এবং সংশোধনী প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এবং শায়খ মাহমুদ শা'বান আব্দুল মাক্বসুদ যিনি হাদিস সমূহের সূত্র অনুসন্ধান ও তথ্য যাচাই বাছাই ও ডকুমেন্টেশন করেছেন।

এবং উস্তায সালেহ আল-ফাওযান; যিনি বইয়ের বুনন, শব্দবিন্যাস এবং কভার ডিজাইন ইত্যাদিতে চমৎকার কাজ করেছেন।

একই সাথে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মুহতারাম সে সকল বন্ধুদের যারা আমাকে গাদীর জলাধার সনাক্তকরণ ও এর পাশ্ববর্তী স্থানসমূহ চিনতে সহায়তা করেছেন।

তাঁরা হলেনঃ শায়খ ড. আহমাদ আল-নু'মানী, শায়খ সালেম আল-গানেমী, উস্তায ইযযুদ্দিন আল-মিসকী, উস্তায মানসুর আল-আন'আম।

এবং পবিত্র মক্কার ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ভূগোলবিদ, অধ্যাপক ড. মি'রাজ মির্যার কথাও স্বরণ করছি; যিনি আমাকে বিভিন্ন মানচিত্র, আকাশ চিত্র এবং বায়বীয় দূরত্ব ইত্যাদির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাঁদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ, প্রশংসা এবং আন্তরিক শুভকামনা, কেননা ইলম ও জ্ঞান পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই বৃদ্ধি পায়।

উৎসর্গ

প্রিয় সহোদরা, মায়ের সাথে যিনি আমাকে মায়ের পরশে বড় করেছেন, যার সাথে আমার শৈশবের খেলার প্রহরগুলো কেটেছে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থায় যিনি আমার পাশে ছিলেনঃ **উম্মু নায়েফ বিন সাঊদ আল-উসাইমি; মুনীরা আল-নাসের আল- তুৱাইরী।**

এবং জীবনসাথী, চলার পথের সঙ্গীনী, ধৈর্যশীলা ও অধ্যাবসায়ী, প্রিয় অর্ধাঙ্গিনীঃ **উম্মু নাসের হায়া বিনতে আলী বিন ফাওযান আলে-মুসা।**

তাঁদের দুই জনের করকমলে আমি এই গ্রন্থ উৎসর্গ করছি সে সব অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ যার উপযুক্ত মূল্যায়ন কখনো আমি করতে সক্ষম হইনি, এবং আল্লাহ তাআ'লার কাছেই তাঁদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

❍ ❍ ❍

মানচিত্র এবং ফটো এ্যালবাম
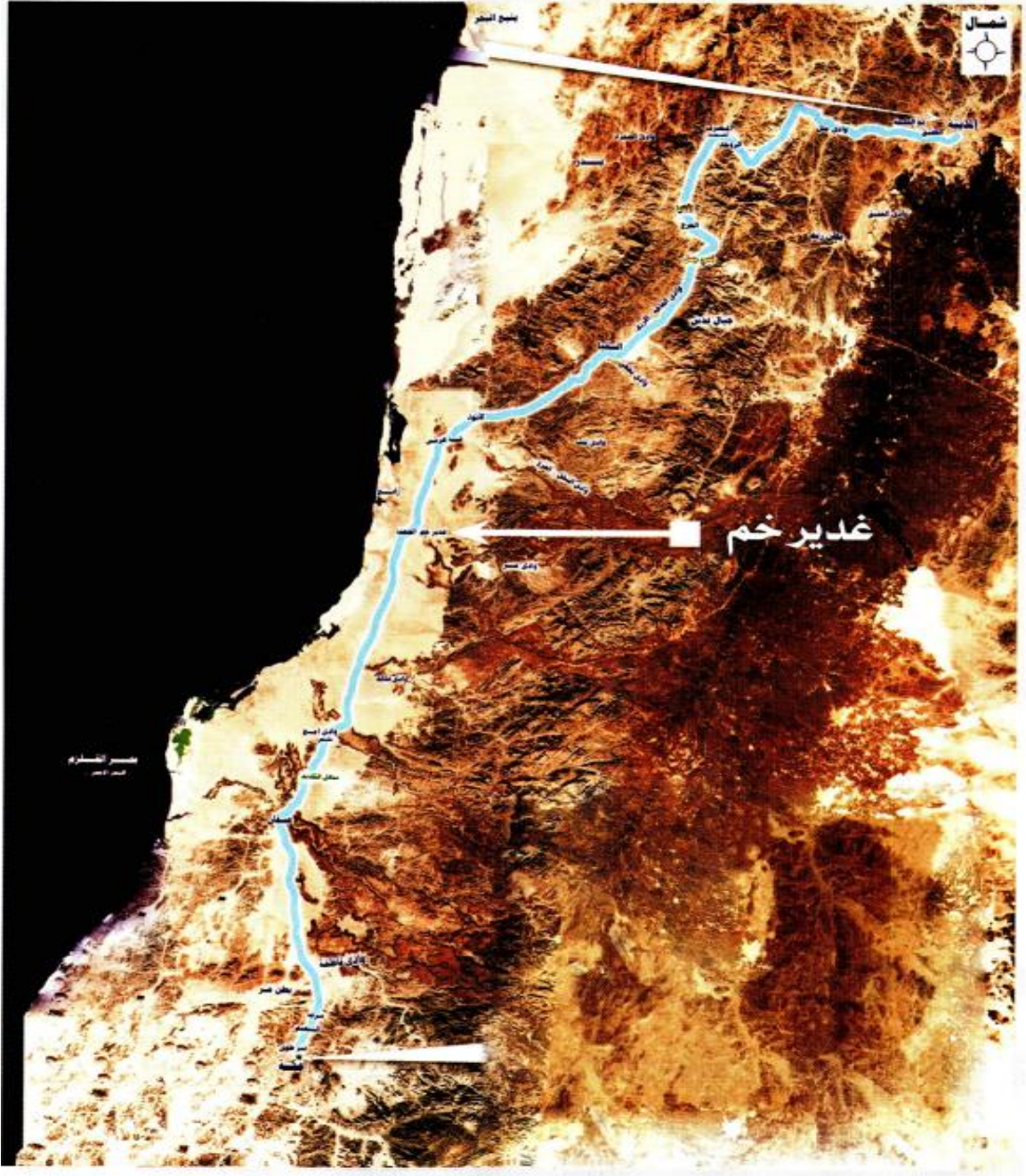
বিদায় হজ্জের রাস্তায় গাদীরে খুম্ম এর লোকেশন

উপর থেকে ধারণ করা ছবিতে গাদীরে খুম্ম ও জুহফার দৃশ্য
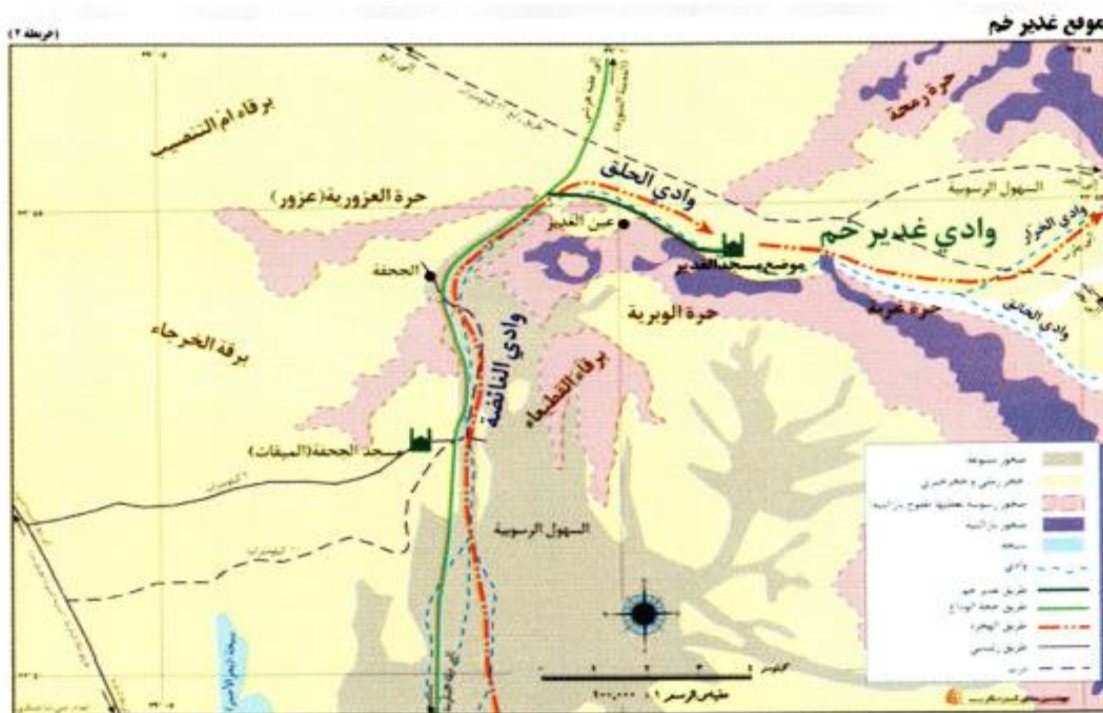
গাদীরে খুম্ম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ম্যাপ

মক্কা এবং মদিনার মাঝে প্রাচীন কাফেলা ও মরুযাত্রীদের চলাচলের রাস্তা যা "ত্বরীকুল আম্বিয়া" নামে পরিচিত। গাদীরে খুম্ম এই রাস্তার পূর্বদিকে অবস্থিত

আল-জুহফা উপত্যকা যার এক প্রান্তে অবস্থান গাদীরে খুম্মের

গাদীরে খুম্মের একটি পুরনো দৃশ্য

গাদীর জলাধার (হাউজ) এর একটি পুরাতন ছবি
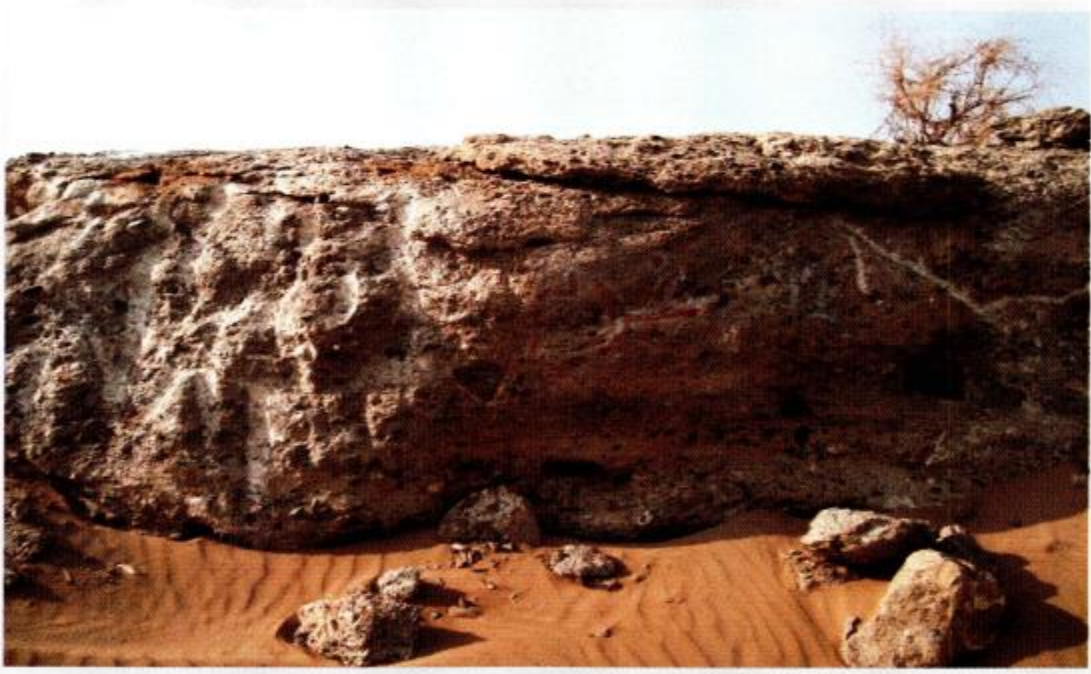
গাদীর স্থলের পুরনো একটি চিত্র
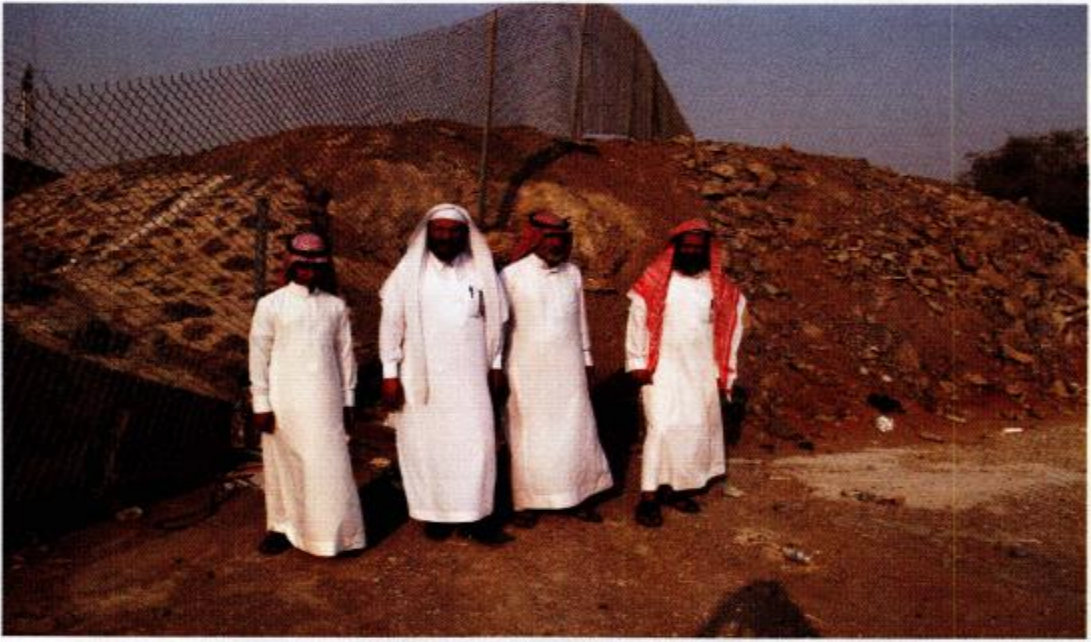
অত্র অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞ রাবেগ এলাকার অধিবাসী সালেম আল-গানেমী, আবেদ আল-বালাদী ও সালেহ আল-আনসারী সহযোগে গাদীরের স্থলে।

ক্বিতারুল হারামাইন (হারামাইন রেলওয়ে) ব্রীজের কোণ থেকে গাদীর ক্ষেত্র

গাদীরে খুম্ম সংলগ্ন উপত্যকায় সামুর বৃক্ষরাজি, সেদিন নবী (সাঃ) এমন দু'টি সামুর গাছের নিচে খুতবা দিয়েছিলেন।

গাদীরে খুম্মে নবীজী (সাঃ) এর নামাজের স্থান হিসেবে কথিত স্থলে দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসবিদ ডঃ আহমাদ আল-নু'মানী

গাদীরে খুম্মের আশেপাশে ছাতা সদৃশ সামুর গাছের সারী।

পাদটীকা

(১) মুসনাদে আহমাদ (৬৪২, ৭৩১), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ কৃত (৯৪৮, ১১০২, ১১০৭), সহীহ মুসলিম (৭৮)।

(২) মুসনাদে আহমাদ (১৪৯০), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৯৫৪, ৯৫৬), সহীহ আল-বুখারী (৩৭০৬, ৪৪১৬), সহীহ মুসলিম (২৪০৪)।

(৩) মুসনাদে আহমাদ (৮৫৭, ৯৩১), সহীহ আল-বুখারী (২৬৯৯, ৪২৫১)।

(৪) মুসনাদে আহমাদ (৭৭৮, ১১১৭), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (১০৪৪, ১১২২), সহীহ আল-বুখারী (৩০০৯, ৪২১০), সহীহ মুসলিম (২৪০৪-২৪০৬)।

(৫) মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবাহ (৩৫৯৩৮), আল-সুনান আল-কুবরা, ইমাম নাসাঈ কৃত (৮৪৩৯, ৮৪৪০), আল-মু'জাম আল-কাবীর, ইমাম তাবারানী কৃত (১৯/৪০-হাদিস নং- ৮৫, ৮৬), মুস্তাদরাক আল-হাকেম (৩/১২৫)।

(৬) ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৭) সহীহ আল-বুখারী (৩৭০৪, ৪৫১৫, ৪৬৫০), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮৪৩৮), সহীহ ইবনু হিব্বান (৫৫৭৯), আল-মু'জাম আল-কাবীর, তাবারানী কৃত (১৩৯৪৮)।

(৮) সহীহ আল-বুখারী (২৭০৪)।

(৯) মুসনাদে আহমাদ (২২৯৯৫), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (১৩৫৮), সুনানু আবি দাঊদ (১১০৯), জামে' আল-তিরিমিযী (৩৭৭৪), সুনানু ইবনি মাজাহ (৩৬০০), সুনান আল-নাসাঈ (৩/১০৮, ১৯২), সহীহ ইবনু খুজাইমা (১৪৫৬, ১৮০১, ১৮০২), সহীহ ইবনু হিব্বান (৬৩০৮, ৬০৩৯), আল-মুস্তাদরাক (১/২৮৭, ৪/১৮৯), মু'জামু ইবনি আসাকির (১১২৭)।

(১০) মুসনাদে আহমাদ (৯৪৮), সহীহ আল-বুখারী (৩৯৬৫ – ৩৯৬৯, ৪৭৪৪), সহীহ মুসলিম (৩০৩৩), সুনানু আবি দাঊদ (২৬৬৫), কিতাবুল জিহাদ, ইমাম ইবনু আবী 'আসেম কৃত (২৯৫), আল-মুস্তাদরাক (৩/১৯৪), দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, ইমাম বায়হাক্বী কৃত (৩/৬৩, ৭৩), আল-সীরাত আল-হালাবিয়্যাহ (২/২১৯)।

(১১) ত্বাবাকাতু ইবনু সা'দ (৩/২০), সীরাতু ইবনু হিশাম (১/৪৮৫, ৪৯৩), তারীখ আল-তাবারী (২/৩৮২), জাওয়ামে' আল-সীরাহ, ইমাম ইবন হাজম কৃত (পৃষ্ঠা- ৭২), সুনান আল-বায়হাক্বী (৬/৪৭২), উসুদুল গাবাহ (৪/৮৭), যাখাইরুল 'উক্ববা ফি মানাক্বিবি যাওয়িল ক্বুরবা, ইমাম মুহিব্ব আল-তাবারী কৃত (পৃষ্ঠা- ২৮১), আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া (৪/৪৮৯), আল-তালখীস আল-হাবীর (৩/২১১), তারীখ আল-খুলাফা (পৃষ্ঠা-১৩০), সুবুল আল-হুদা ওয়া আল-রাশাদ (৩/২৩৯), ইরওয়া আল-গালীল (১৫৪৬), আসমা আল-মাত্বালিব ফি সিরাতি আমির আল-মু'মিনীন আলী ইবনু আবি তালিব রাঃ (পৃষ্ঠা-৫২)।

(১২) মুসনাদে আহমাদ (৪, ৫৯৪, ৫৯৭৭), সহীহ আল-বুখারী (৩৬৯, ৪৬৫৫-৪৬৫৭), সহীহ মুসলিম (১৩৪৭), সুনানু আবি দাঊদ (১৯৪৬), জামে' আল-তিরমিজী (৮৭১, ৩০৯১, ৩০৯২)।

(১৩) মুসনাদ আল-ত্বয়ালিসি (১৭৭৩), সিরাতু ইবনু হিশাম (২/৬০৩), মুসনাদে আহমাদ (১৩৭৪, ২৩৫৯, ২৩০৩৬, ২২৯৬৭), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৯৮৯, ১১৭৭, ১১৭৯, ১১৮০), সহীহ আল-বুখারী (২২৯৯, ৪৩৪৯, ৪৩৫০), সহীহ মুসলিম (১২১৮, ১৩১৭), সুনানু আবি দাঊদ (১৮৬৬, ১৯০৫), জামে' আল-তিরমিজি (১৭০৪, ৩৭১২), সুনানু ইবনু মাজাহ (৩০৭৪), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮৪২৮), মুসনাদ আ-রুওয়ানী (৩০৪), তারীখ আল-তাবারী (৩/১৪৯), সহীহ ইবনু হিব্বান (৩৯৪৪, ৬৯২৯), আল-মুস্তাদরাক (২/১২৯-১৩০),(৩/১১০), হাজ্জাতুল বিদা', ইবনে হাজম কৃত, এবং সুনান আল-বায়হাক্বী, (২/৫১৬),দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, বায়হাক্বী কৃত (৫/৩৯৮-৩৯৯), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/১৮৯-২০০), আল-রাওয আল-উনফ (৭/৫০৫), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (৭/২৯৫, ৩৯০-৩৯২, ৬৬৫-৬৬৮), (১১/৫৯-৬৪), ফাতহুল বারী (৮/৬৬), আল-সিলসিলা আল-সাহীহাহ (২২২৩), এবং "কা-আন্নাকা মা'আহু", সিফাতু হাজ্জাতিন্নাবীয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামা কা-আন্নাকা মা'আহু।

(১৪) ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৫) দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, বায়হাক্বী কৃত (৫/৩৯৮), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/২০০), প্রাগুক্ত।

(১৬) মুসনাদে আহমাদ (১২৭৩০, ১২৭৬৬, ১৩৯১৩), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (১৪৩১), সহীহ আল-বুখারী (৩৭৭৮, ৪৩৩০-৪৩৩৪), সহীহ মুসলিম (১০৫৯), জামে' আল-তিরমিজি (৩৯০১), সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮২৭৭, ১১১৫৮), সহীহ ইবনু হিব্বান (৭২৭৮)।

(১৭) মুসনাদে আহমাদ (৫৯৬, ৮৩৮), সহীহ আল-বুখারী (৩১১৩, ৩৭০৫, ৫৩৬১, ৬৩১৮), সহীহ মুসলিম (২৭২৭, ২৭২৮), সুনানু আবি দাউদ (২৯৮৮, ৫০৬২, ৫০৬৩), সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৯১২৭), সহীহ ইবনু হিব্বান (৬৯২১, ৬৯২২)।

(১৮) ফাতহুল বারী (১২/৩০৯)।

(১৯) মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবাহ (৩২৯০০), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৮৮২, ৮৮৪, ৯০৫), মাক্বতালু আলী, ইমাম ইবনু আবি আল-দুনিয়া কৃত (১০৫), আল-মু'জাম আল-আওসাত, তাবারানী কৃত (৩৯৩৪), কিতাব আল-শরীয়া, ইমাম আল-আজুররী কৃত (১২১৮), হিলয়াতুল আউলিয়া (১/৮১, ৮৫), তারীখু দিমাশক্ব (২৪/৪০১), (৪২/৪৭৭-৪৭৮)/

(২০) নাহজ আল-বালাগাহ (১৬/৩৬৯)।

(২১) ১৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২২) তাবাক্বাতু ইবনু সা'দ (৩/৩৭), আল-যুহদ, আবু দাউদ কৃত (১০৫), মাক্বতালু আলী, ইবনু আবি আল-দুনিয়া কৃত (৯৮, ১০২), মুসনাদ আল-বাজ্জার (১৩৩৯), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮৩৫৪), মুসনাদু আবী ইয়া'লা (৬৭৫৮), সহীহ ইবনু হিব্বান (৬৯৩৬), আল-সুন্নাহ, খাল্লাল কৃত (৪৭১), আল-মু'জাম আল-কাবীর, তাবারানী কৃত (২৭১৯, ২৭২২, ২৭২৩), আল-মু'জাম আল-আওসাত (৮৪৬৯), হিলয়াতুল আউলিয়া (১/৬৫), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/৫৬০, ৫৮১)।

(২৩) ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২৪) ৩৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২৫) ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২৬) মুসনাদে আহমাদ (১৬২৯, ১৬৩১), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৮৫, ৮৭, ২৫৬), সুনানু আবী দাউদ (৪৬৪৯), জামে' আল-তিরমিজি (৩৭৪৮),

সুনানু ইবনু মাজাহ (১৩৩), আল-সুন্নাহ, ইবনু আবী আসেম কৃত (১৪২৮-১৪৩২), সহীহ ইবনু হিব্বান (৬৯৯৩), আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ (৩/২৮৪-২৮৫), (১০৮৫)।

(২৭) মুসনাদে আহমাদ (৩৭১৭, ১২০১৩, ১৩০৬৮), সহীহ আল-বুখারী (৬১৬৮-৬১৭১), সহীহ মুসলিম (২৬৪০)।

(২৮) মুসনাদে আহমাদ (১৪৫৫৩, ১৪৯৪৬), সহীহ মুসলিম (১২৯৭), সুনানু আবী দাঊদ (১৯৭০), জামে' আল-তিরমিজি (৮৮৬), সুনানু ইবনু মাজাহ (৩০২৩), সুনান আল-নাসাঈ (৫/২৭০), সহীহ ইবনু খুজাইমাহ (২৮৭৭)।

(২৯) মুসনাদে আহমাদ (১৯৩৬), সহীহ আল-বুখারী (১৭৫৫) –সংক্ষেপিত-সহীহ মসলিম (১৩২৭, ১৩২৮), শারহু মা'আনী আল-আছার (২/২৩৩), সহীহ ইবনু খুজাইমাহ (৩০০০), সহীহ ইবনু হিব্বান (৩৮৯৭), সুনান আল-দারাকুতনী (৩/৭৩), আল-মুস্তাদরাক (১/৪৭৬)।

(৩০) মু'জাম আল-বুলদান (২/১১১, ৩৮৯), মুজামু মা'আলিম আল-হিজাজ (১২৪৩)।

(৩১) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৬৬, ২০৬৯৫, ২২২৬০, ২৩৪৯৭), সহীহ আল-বুখারী (৪৪০৩), সহীহ মসলিম (১২১৮), সুনানু আবী দাঊদ (১৯০৫), সহীহ ইবনু খুজাইমাহ (৩০০০), জামে' আল-তিরমিজি (১১৬৩), সুনানু ইবন মাজাহ (১৮৫১, ৩০৫৭, ৩০৭৪), সহীহ ইবনু খুজাইমাহ (২৮০৮ - ২৮১০), সহীহ ইবনু হিব্বান (১৪৫৭)।

(৩২) মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা (৩৪৬৪৮), সহীহ আল-বুখারী (৪৮৩), হিলয়াতুল আউলিয়া (১/৩১০), সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (৩/২৩৭), ফাতহুল বারী, ইবনু রাজাব কৃত (৩/৪২৮)।

(৩৩) আল-ইয়াওম আল-নাবাওয়ীঃ উমসিয়াত আল-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(৩৪) মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা (৩২১১৮), মুসনাদে আহমাদ (১৮৪৭৯, ১৯২৭৯, ১৯২৬৫, ১৯৩২৫), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৯৯২, ১০১৬, ১০১৭, ১০৪৮), মুসনাদু আবদ ইবনু হুমাইদ (২৬৫), মুসনাদ আল-দারামী (৩৩৫৯), সহীহ মুসলিম (২৪০৮), জামে' আল-তিরমিজি (৩৭১৩), সুনানু ইবনু মাজাহ

(১১৬), আল-সুন্নাহ, ইবনু আবী আসেম কৃত (১৫৫০-১৫৫২), মসনাদ আল-বাজ্জার (৪৩২৪-৪৩২৭, ৪৩৩৬), সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮১১৯, ৮৪১০, ৮৪১৫), সহীহ ইবনু খুজাইমাহ (২৩৫৭), শারহু মুশকিল আল-আছার (৩৪৬৪), আল-মু'জাম আল-কাবীর, তাবারানী কৃত (৫০২৮), ফাযায়েল আল-খুলাফা আল-রাশিদিন, আবু নু'আইম কৃত (১৭-১৯), আল-মুস্তাদরাক (৩/১০৯, ১১৬, ৫৩৩), সুনান আল-বায়হাক্বী (২/২১২), (৭,৪৮), আল-সিলসিলা আল-সাহীহাহ (১৭৫০)।

(৩৫) ১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৩৬) সিরাতু ইবনু হিশাম (২/২২৪-২২৫), তাবাক্বাতু ইবনু সা'দ (২/৬৪), তারীখ আল-তাবারী (২/৫৭৪), আল-মুস্তাদরাক (৩/৩২), সুনান আল-বায়হাক্বী (২/৫০২), আল-কামিল ফি আল-তারীখ (২/৬৭), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (৬/৪১-৪৩), আসমাল মাতালিব ফি সিরাতি আমীরিল মু'মিনীন আলী ইবনু আবী তালিব (পৃষ্ঠাঃ ১৩০)।

(৩৭) সহীহ মুসলিম (১৮০৭), এবং ৭০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৩৮) আল-মু'জাম আল-কাবীর, তাবারানী কৃত (২৩/১৪, ২৩), আল-মুস্তাদরাক (১/১৫-১৬), শু'আবুল ঈমান (৯১২২, ৯১২৩), আল-সিলসিলা আল-সাহীহাহ (১৭৫০)।

(৩৯) এই বিষয়বস্তু ইমাম আহমাদ, ইমাম নাসাঈ, এবং ইসমাঈল ইবনু ইসহাক আল-কাযী থেকে বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ আল-মুস্তাদরাক (৩/১১৬), আল-ইস্তি'আব (৩/১১১৫), তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (২/১২০), আল-রিয়াজ আল-নাদ্বিরাহ ফি মানাক্বিব আল-আশারাহ (৩/১৮৮), আল-জাওহারাহ ফি নাসাব আল-নাবিয়্যি ওয়া আসহাবিহিল আশারাহ (২/২৫৪), ফাতহ আল-বারী (৭/৭৪)।

(৪০) মসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা (৩২১১৮), মুসনাদে আহমাদ (১৮৪৭৯), ফাযায়েল আল-সাহাবা, আহমাদ কৃত (১০১৬, ১০৪২), আল-ইস্তি'আব (২/১৮), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/২২১, ২৩৩, ২৩৪), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (১১/৭৪), তাফসির আল-মানার (৬/৩৮৫), আল-সিলসিলা আল-সাহীহাহ (১৭৫০)। আল-সিলসিলা আল-যায়ীফাহ (৪৯২৩)।

(৪১) মুসনাদে আহমাদ (২২৯৬৭), ফাযায়েল আল-সাহাবা, আহমাদ কৃত (১১৮০), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮৪২৮)।

(৪২) তারীখু দিমাশক্ব (৪২/২৩৫), আল-রিয়াজ আল-নাদ্বিরাহ ফি মানাক্বিব আল-আশারাহ (৩/১২৮), ফায়জুল ক্বাদীর (৬/২১৭)।

এই হাদীসের সনদে কিছু দূর্বলতা রয়েছে, এই জন্য শাইখ আলবানী এটিকে তদীয় ‘আল-সিলসিলা আল-যায়ীফাহ’তে সন্নিবেশ করেছেন (১০/৬৯৩) (৪৯৬১), কিন্তু অর্থগত দিক থেকে বিচার করলে এই হাদিস উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলে-বাইত সম্পর্কে বর্ণিত রিওয়াতের আথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তাই একে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করাই উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়।

(৪৩) মুসনাদে আহমাদ (২৩৫৬৩), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৯৬৭), আল-মু’জাম আল-কাবীর,তাবারানী কৃত (৪০৫২, ৪০৫৩)।

(৪৪) মুসনাদে আহমাদ (৫৫), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৫৩১), সহীহ আল-বুখারী (৩৭১২, ৪০৩৫, ৪২৪০), সহীহ মুসলিম (১৭৫৯)।

(৪৫) ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৯৭১), সহীহ আল-বুখারী (৩৭১৩, ৩৭৫১), মুসনাদু আবী বাকর আল-সিদ্দি্ মারওয়াজী কৃত (২৪), মাজলিসুন মিন আমালী আবি বাকর আল-নাজ্জাদ (৬)।

(৪৬) মাত্বালি’ আল-আনওয়ার (৩/১৮১), কাশফ আল-মুশকিল (১/৩৩), ফাতহুল বারী (৭/৭৯), দলীল আল-ফালিহিন (৩/২০২)।

(৪৭) সিয়ারু আ’লাম আন-নুবালা (১৩/৩৪১)।

(৪৮) মুসনাদে আহমাদ (১৯২৬৫, ১৯২৭৯), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৯৯২), সহীহ মুসলিম (২৪০৮), আল-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম (১৫৫৫), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮০৯২, ৮৪১০), শারহু মুশকিল আল-আছার (১৭৬৫), আল-শরী’আহ, আল-আজুররী কৃত (১৫২৩, ১৭০৬), আল-মু’জাম আল-কাবীর, তাবারানী (৪৯৬৯, ৪৯৭০)।

(৪৯) মুসনাদে আহমাদ (৬৪১, ৯৫০, ৯৬১, ১৯৩০২), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৯৯১, ১১৬৭), আল-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম (১৩৭২), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮৪১৬, ৮৪২৪, ৮৪৩০), মুসনাদু আবী ইয়া’লা (৫৬৭), সহীহ ইবনু হিব্বান (৬৯৩১), আল-মু’জাম আল-কাবীর, তাবারানী (৪৯৮৫), আল-মুস্তাদরাক (৩/১০৯), আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ (২/১০৫-১০৬), (৪৭৯-৪৮১)।

(৫০) মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা (৩২০৯১), আল-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম (১৩৭২, ১৩৭৪), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ কৃত (৮৪১৯), আল-মু'জাম আল-আওসাত্ব, তাবারানী (২২৫৪), হিলয়াতুল আউলিয়া (৫/২৬-২৭), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/২০৯), আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ (২/৮৭), (৪৬৪)।

(৫১) আল-সিলসিলা আল-সাহীহাহ (১৭৫০), আনীস আল-সারী তাখরীজু আহাদীসি ফাতহিল বারী (৭/৫২৬৬-৫৩০১)।

(৫২) সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (৮/৩৩৫), ক্বুতুফ আল-আযহার আল-মুতানাসিরাহ ফি আল-আখবার আল-মুতাওয়াতিরাহ (পৃষ্ঠাঃ ১০০), আল-তাইসির বি-শারহিল জামি' আল-সাগীর (২/৪৪২), কাশফুল খাফা (২/৩২৯), নাযম আল-মুতানাসির (২৩২), আল-সিলসিলা আল-সাহীহাহ (১৭৫০), এই হাদিসকে যারা দূর্বল বলেছেন আলবানী এখানে তাঁদের খন্ডায়ন করেছেন।

(৫৩) ফাতহুল বারী (৭/৭৪)।

(৫৪) মিনহাজ আল-সুন্নাহ আল-নাবাওয়ীয়্যাহ (৭/৩১৯-৩২০), সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (১৭/১৬৯), আল-রিসালাহ আল-মুস্তাতরিফাহ (পৃ- ১১২), তাযকিরাতুল হুফফাজ, যাহাবী (৩/১৬৪), আল-বিদায়া আল-নিহায়া (৭/৬৬৬), ফাতহুল বারী (৭/৭৪)।

(৫৫) ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৫৬) তাওয়ীলু মুখতালাফিল হাদিস (পৃঃ ৯২-৯৩), আল-হিদায়াহ ইলা বুলুগ আল-নিহায়াহ (৪/২৯৮৫), তাফসিরুল মাওয়ারদী (১/১৬৩), যাদুল মাসির (১/৯১), তাফসিরুল ক্বুরতুবী (২/৫১), তাফিসরুল খাজিন (১/৬৩), ফাতহুল বারী (৭/৭২)।

(৫৭) ৫৫ নং পৃষ্ঠা থেকে ৬৬ নং পৃষ্ঠার জন্য কিতাব (আল-ইহতিজাজ) এর প্রথম খন্ড দ্রষ্টব্য।

(৫৮) আল-গাদীর, আবদুল হুসাইন আল-আমিনী কৃত (১/২১৫)।

(৫৯) মুকাদ্দিমাতু ইবনু খালদুন, শাদ্দাদী সম্পাদিত (১/১৩) ও পরবর্তী অংশ।

(৬০) দেখুনঃ "কা-আন্নাকা মা'আহুঃ সিফাতু হাজ্জাতিন্নাবীয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামা কা-আন্নাকা মা'আহু।

(৬১) ২৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৬২) ২৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৬৩) মুসনাদ আল-ত্বয়ালিসি (১৪৭০), মুসনাদে আহমাদ (২৪৪৮৩), ২৬৪১৩), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (১৩২২, ১৩৪৩),সহীহ আল-বুখারী (৩৬২৩- ৩৬২৬),সহীহ মুসলিম (২৪৫০)।

(৬৪) মুসনাদে আহমাদ (১৫১১, ২৪৩২, ৩০৬১), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (৬৭, ১৩৪, ৯৮৫, ১১৬৮), সহীহ আল-বুখারী (৪৬৭, ৩৬২৮, ৩৮০০), জামে' আল-তিরমিজী (৩৭৩২), আল-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম (২৪৬৩), আল-সুনান আল-কুবরা, নাসাঈ (৪০৪৮, ৮৩৫৫), আল-মুস্তাদরাক (৩/১২৫), আল-আহাদিস আল-মুখতারাহ (১৩/২৭-৩০), (৩২-৩৭), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/৯৯-১০২), আল-মাওযু'আত, ইবনুল জাওযী (১/৩৬৩), তাফসিরু ইবনু কাসির (২/৩১১), ফাতহুল বারী (৭/১৪-১৫), নাযম আল-মুতানাসির (পৃঃ ১৯১-১৯২), আল-সিলসিলাহ আল-যায়ীফাহ (২৯২৯, ৪৯৫৩)।

ইবনুল জাওযী, ইবনু কাসির সহ আরো কিছু উলামায়ে কেরাম হাদিসের "ইল্লা বাবা আলী" (আলী রাঃ এর দরজাকে বন্ধ না করা) সম্পর্কিত অংশটিকে দূর্বল বলেছেন – দূর্বল বর্ণনাকারী, সহীহ হাদিসের বিপরীত ভাষ্য এবং শিয়া বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে পরবর্তীতে যোগ করার কারণ উল্ল্যেখ করে-, কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার রাহঃ হাদিসে "খাওখাহ ও বাব" দুই অংশ থাকার মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, - উল্ল্যেখিত আপত্তিগুলো এবং বাহ্যিক অসংগতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন-। বিস্তারিত দেখুনঃ আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ (১৬-১৯), আল-নুকাত 'আলা কিতাবি ইবন আল-সালাহ (১/৪৬২-৪৭০)।

(৬৫) সহীহ আল-বুখারী (১৯৮, ৭১২, ৭১৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৮), সহীহ মুসলিম (৪১৮)।

(৬৬) সহীহ আল-বুখারী (৬৬৪, ৬৭৯, ৭১৩), সহীহ মুসলিম (৪১৮)।

(৬৭) আল-শরী'আহ, আজুররী (৪/১৭১২, ১৭২৩), (৪/২৩৩৭), ফাযায়েল আল-খুলাফা আল-রাশিদিন (১৮৯), আল-আমালী, ইবন বুশরান কৃত (৫১২), আল-তামহিদ (২২/১২৯), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/৪৪২), তারীখ আল-ইসলাম (৩/৬৪০), তারীখ আল-খুলাফা (১৩৭)।

(৬৮) মুসান্নাফু আবদ আল-রাজ্জাক্ব (৯৭৫৮), সিরাতু ইবনু হিশাম (২/৬৬০), মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা (৩৭০৪৩), মুসনাদে আহমাদ (১৩৩, ৩৯১), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (১৯০), সহীহ আল-বুখারী (৩৬৬৭-৩৬৭০), আল-সুনান আল-কুবরা নাসাঈ (৭০৮১), তারীখ আল-তাবারী (৩/২১৮), আল-বিদায়া আল-নিহায়া (৮/৮১-৮৭)।

(৬৯) মুসান্নাফু আবদ আল-রাজ্জাক্ব (৯৭৪৩), সিরাতু ইবনু হিশাম (১/৪৮২-৪৮৩), ত্ববাক্বাতু ইবনি সা'দ (১/১৯৪), মুসনাদে আহমাদ (৩০৬১), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ কৃত (১১৬৮), তাফসিরু ইবনি আবী হাতিম (৬/১৭৯৯), আল-মুস্তাদরাক (৩/৪-৫), দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, বায়হাক্বী (২/৪৬৫-৪৭০), সাহীহ আল-সিরাহ আল-নাবাওয়ীয়্যাহ, ইবরাহীম আল-আলী (পৃঃ ১২০), আসমাল মাতালিব ফি সিরাতি আমীরিল মু' মিনীন আলী ইবনু আবী তালিব (পৃষ্ঠাঃ ৫২-৫৩)।

(৭০) সহীহ মুসলিম (১৮০৭), আল-মুস্তাদরাক (৩/৪৩৭), সুনান আল- বায়হাক্বী (৬/৫০৪,), দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ,বায়হাক্বী কৃত (২/৪৬৫-৪৭০),আল-দুরার ফি ইখতিসার আল-মাগাযী ওয়া আল-সিয়ার, ইবনু আবদিল বারর কৃত (১৯৯), তাহযিব আল-আসমা ওয়া আল-লুগাত (১/৯২), শারহু সহীহ মুসলিম, ইমাম নববি কৃত (১২/১৮৬), সুবুল আল-হুদা ওয়া আল-রাশাদ (৫/১২৫), সহীহ আল-সিরাহ আল-নাবাওয়ীয়্যাহ, ইবরাহীম আল-আলী (পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫), আসমাল মাতালিব ফি সিরাতি আমীরিল মু' মিনীন আলী ইবনু আবী তালিব (পৃষ্ঠাঃ ১৪০)।

(৭১) ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৭২) ফাযায়েল আল-সাহাবাহ,ইমাম দারাক্কুতনী কৃত (৪০), আল-ই'তিক্বাদ, বায়হাক্বী কৃত (৩৫৫), আল-হুজ্জাহ ফি বায়ান আল-মাহাজ্জাহ (২/৩৭৭-৩৭৮), তারীখু দিমাশক্ব (২৭/৩৭৫)।

(৭৩) যিকরায়াতু আকী আল-তানতাওয়ী (৩/৩৮৬-৩৮৮)।

(৭৪) সহীহ আল-বুখারী (১৩৯৯, ১৪০০, ৬৯২৪, ৬৯২৫), সহীহ মুসলিম (২০)।

(৭৫) আল-খিরাজ, ইমাম আবু ইউসুফ কৃত (৩৬-৩৭, ৪৫-৪৬), আল-আমওয়াল, কাসেম ইবন সাল্লাম (১৪৭), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ (৩৭৮), আল-

আমওয়াল, ইবনে জানযুওয়াহ (২২৪), সুনান আল-বায়হাক্বী (৬/৫১৭), (৯/২৩৩), তারীখু দিমাশক্ব (২/১৯৬-১৯৭), আল-রাওজুল উনফ (৭/১৩২)।

(৭৬) সহীহ আল-বুখারী (১৫৬৩), সহীহ মুসলিম (১২২৩), এবং ৯৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৭৭) সহীহ আল-বুখারী (১৩৯২, ৩৭০০)।

(৭৮) ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (৩/১৮৩), মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা (৩২০৪০, ৩৭০৫৭), মুসনাদে আহমাদ (২৫৯), তারীখ আল-মাদীনাহ, উমর ইবন শাব্বাহ (২/৬৬৫-৬৬৭), তারীখ আল-তাবারী (৩/৪২৮), আল-সুন্নাহ, খাল্লাল (১/২৭৬), তারীখু দিমাশক্ব (৩০/৪১০), (৪৪/২৫৭), উসুদুল গাবাহ (৪/১৫৬), তারীখ আল-ইসলাম (৩/১১৬), তারীখ আল-খুলাফা (৬৬)।

(৭৯) সীরাতু ইবনু হিশাম (১/৪৪২), মুসনাদে আহমাদ (১৪৪৫৭, ১৪৬৫৩), আখবারু মাক্কাহ, ফাকেহি (৪/২১৫), তারীখ আল-তাবারী (২/৩৬২), দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, বায়হাক্বী (২/৪৪৭), আল-কামেল ফি আল-তারীখ (১/৬৯২), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (৪/৪০১)।

(৮০) আনসাব আল-আশরাফ (১/৭০), আল-মুনাম্মাক্ব ফি আখবারি কুরাইশ (৮৬-৮৭), তারীখ আল-তাবারী (২/২৪৯), কবিদের নাম ও পংক্তির ভিন্নতা সহকারে।

(৮১) মুসনাদে আহমাদ (১২১৮৭, ১৩৫৭৪, ১৯৫৪১), সহীহ আল-বুখারী (৩৫২৮, ৬৭৬২), সহীহ মুসলিম (১০৫৯)।

(৮২) ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (৩/৫৬৯) (৯/৩৯৪), তারীখু দিমাশক্ব (২০/২৬৫), উসুদুল গাবাহ (৩/৩২৯), তারীখ আল-ইসলাম (৩/১৪৮)।

(৮৩) সীরাতু ইবনু হিশাম (১/১২৯-১৩২), আল-মুনাম্মাক্ব ফি আখবারি কুরাইশ (১৮৯-১৯০), আখবারু মাক্কাহ, আযরুক্বী (১/১১০), আখবারু মাক্কাহ, ফাকেহি (৫/১৫৮)।

(৮৪) ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (৫/১৮৯), সীরাতু ইবনু হিশাম (২/৩১৫), মুসনাদে আহমাদ (১৮৯১০), তাফসীর আল-তাবারী (২১/২৭২-২৭৩), তারীখু দিমাশক্ব (৩৯/৭৮), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (৬/২১৪)।

(৮৫) সহীহ আল-বুখারী (২৮৩৪), সহীহ মুসলিম (১৭৮৮), তাফসীর আল-তাবারী (৩/৬৩৬)।

(৮৬) সহীহ আল-বুখারী (.৩৬৯৮, ৪০৬৬)।

(৮৭) মুসনাদে আহমাদ (৫১১), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ (৮২৭, ৮৪৯), সহীহ আল-বুখারী –মু'আল্লাক্ব সূত্রে, অর্থাৎ যার সনদের শুরুতে এক বা একাধীক বর্ণনাকারীর নাম উল্ল্যেখ করা হয়নি-(৩/১০৯), (৫/১৩), তারীখ আল-মাদীনাহ, উমর ইবনু শাব্বাহ (১/১৫২), জামে' আল-তিরমিযী (৩৬৯৯), সুনান আল-নাসাঈ (৬/২৩৬), সহীহ ইবনু খুজাইমাহ (২৪৮৭, ২৪৯১), সহীহ ইবনু হিব্বান (৬৯১৬, ৬৯২০), আল-মুস্তাদরাক (১/৪১৯), আল-আহাদিস আল-মুখতারাহ (১/৪৮২-৪৮৪), (৩৫৮-৩৬০)।

(৮৮) মাগাযী, ওয়াক্বেদী রচিত (১/১১১-১১২), মুসনাদু আবদ ইবনু হুমাইদ (১২১১), আল-মুস্তাদরাক (৩/২২৪), তারীখু দিমাশক্ব (৩৮/২৬০), ইমতা' আল-আসমা' (১২/১৬১)।

(৮৯) ৭৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯০) আল-উম্ম (৪/২২৮), তারীখ আল-মাদীনাহ (২/৫৪৭), তারীখ আল-তাবারী (৩/২৪৬)।

(৯১) তারীখ আল-তাবারী (৪/৪৩৪), আল-মুন্তাজাম (৫/৬৫), আল-কামেল ফি আল-তারীখ (২/৫৫৬), নাহজ আল-বালাগাহ (৭/২৭), আসমাল মাতালিব ফি সিরাতি আমীরিল মু'মিনীন আলী ইবনু আবী তালিব (৮৫১)।

(৯২) খিলাফাতু আমিরিল মু'মিনীন আব্দিল্লাহ ইবন আল-যুবায়ের (রাঃ) (পৃষ্ঠা-৩৯)।

(৯৩) মুসান্নাফু আবদ আল-রাজ্জাক (৯৭১৯), তাফসীরু আবদ আল-রাজ্জাক (২/৩০২), সীরাতু ইবনু হিশাম (২/২৪৫), তাফসীর আল-তাবারী (১৪/৪২১), আল-মুজাম আল-কাবীর, তাবারানী (২৪/৪৩২), (১০৫৯), আল-শরী'আহ, আজুররী (১০৩০, ১২৫৯), আল-মুস্তাদরাক (৩/৬৫, ৮১), মা'রিফাত আল-সাহাবাহ, আবু নু'আঈম (৬২), দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, বায়হাক্বী (২/৩৬০-৩৬১), তারীখু দিমাশক্ব (৩০/৫৫), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (৪/২৮১), মা'আল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৪৭)।

(৯৪) সীরাতু ইবনু হিশাম (১/৩১৯-৩২০), মুসনাদে আহমাদ (৪৩৯), আল-মুজাম আল-কাবীর, তাবারানী (২৪/৩০৩) (৭৬৯), আল-মুস্তাদরাক (৩/৩৮৩, ৩৮৮), মা'রিফাত আল-সাহাবাহ, আবু নু'আঈম (৫/২৮১৩), দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, বায়হাক্বী (২/২৮২), তারীখু দিমাশক্ব (৪৩/৩৬৮), উসুদুল গাবাহ (৪/১২২), সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (১/৪০৯), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (৪/১৪৭), আল-ইসাবাহ (৭/২৯২)।

(৯৫) মুসনাদে আহমাদ (৬৫৩৮), সহীহ আল-বুখারী (৪৪৭, ২৮১২), সহীহ মুসলিম (২৯১৬), আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (৬/২১৪)।

(৯৬) ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (৩/২৪০), মুসনাদ আল-ত্বয়ালিসী (৬৭৮), মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৮৪), সহীহ ইবনু হিব্বান (৭০৮০), আল-মুস্তাদরাক (৩/৩৮৪, ৩৮৬, ৩৯৬), আল-ইস্তি'আব (৩/১১৪০), তারীখু দিমাশক্ব (৪৩/৩৬২), তাহযীব আল-কামাল (২১/২২৬), সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (১/৪০৮)।

(৯৭) মুসনাদে আহমাদ (১১৮৩, ১৩২৮, ১৩৬২), সুনানু আবী দাউদ (৪৩৯৯-৪৪০৩), জামে' আল-তিরমিযী (১৪২৩), সুনানু ইবনু মাজাহ (২০৪১), সহীহ ইবনু খুজাইমাহ (১০০৩, ৩০৪৮), সহীহ ইবনু হিব্বান (১৪৩), আল-মুস্তাদরাক (১/২৫৮), সুনান আল-বায়হাক্বী (৪/৪৪৮), আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ (২/২২৮-২২৯), (৬০৭-৬০৮)।

(৯৮) ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (২/২৯৩), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ (১১০০), মু'জাম আল-সাহাবাহ, বাগাওয়ী (১৮১৭), আল-ইস্তি'আব (৩/১১০৩), তারীখু দিমাশক্ব (৪২/৪০২), ফাতহুল বারী (১৩/৩৪৩), তারীখুল খুলাফা (১৩৩)।

(৯৯) মুসনাদ আল-ত্বয়ালিসী (৯৬), মুসনাদে আহমাদ (৪০২, ৪৩১, ১১৪৬), সহীহ আল-বুখারী (১৫৬৩), সহীহ মুসলিম (১২২৩), সুনান আল-নাসাঈ (৫/১৪৮)।

(১০০) মুসনাদে আহমাদ (৩০৯২, ৩৭১১, ৩৭১২, ৯০৯৩), সহীহ আল-বুখারী (৩০৯২, ৩০৯৩, ৩৭১১, ৩৭১২), সহীহ মুসলিম (১৭৫৯)।

(১০১) মুসনাদে আহমাদ (৪০), সহীহ আল-বুখারী (৩৫৪২, ৩৭৫০)।

(১০২) ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (৬/৪৪২), তারীখ আল-তাবারী (৫/৪৬৮), আল-মু'জাম আল-কাবীর, তাবারানী (২৮০৩), আল-ছিকাত, ইবনু হিব্বান (২/৩১১)।

(১০৩) মুসান্নাফু আবদ আল-রাজ্জাক (৭৯৫০), আল-ইস্তি'আব (৪/১৭৪৮-১৭৮৫), তাহযীব আল-কামাল (৩৫/১২৭), আল-বিদায়া আল-নিহায়া (৬/৪৪৪-৪৪৫)।

(১০৪) মা'রিফাত আল-সাহাবাহ, আবু নু'আঈম (১/১৬৮), উসুদুল গাবাহ (৫/৯৭)।

(১০৫) সীরাতু ইবনু ইসহাক (১/২৪৮), ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (১০/৪২৯), আল-যুররিয়্যাত আল-তাহিরাহ (৬১, ১১৬), তারীখু দিমাশক্ব (১৯/৪৮২), উসুদুল গাবাহ (৭/৩৭৭), আল-ইসাবাহ (৪/১২৪)।

(১০৬) মুসান্নাফু আবদ আল-রাজ্জাক (১০৩৫৪), সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর (৫২০), ফাযায়েল আল-সাহাবাহ, আহমাদ (১০৬৯, ১০৭০),আল-যুররিয়্যাত আল-তাহিরাহ (২১৮-২১৯), আল-শরী'আহ, আজুররী (১৭১৪, ১৮২০), আল-মুস্তাদরাক (৩/১৪২), আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ (১/১৯৭-১৯৮), মুসনাদ আল-ফারুক (১/৩৮৯-৩৯২), আল-সিলসিলাহ আল-সাহীহাহ (২০৩৬)।

(১০৭) ত্ববাকাতু ইবনু সা'দ (১০/৪২৯), আল-তারীখ আল-আওসাত্ব, ইমাম বুখারী রচিত (১/১০২), সুনান আল-বায়হাক্বী (৭/১১১-১১২), দালায়েল আল-নুবুওয়্যাহ, বায়হাক্বী (৭/২৮৩), তারীখু দিমাশক্ব (১৯/৪৮৩), সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (৩/৫০২), আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত (১৫/২৪, ২৭২)।

(১০৮) মাক্বতালু আলী, ইবনু আবী আল-দুনিয়া (১২৭), তারীখু দিমাশক্ব (৪৫/৩০৪), সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (৪/১৩৪)।

(১০৯) সহীহ আল-বুখারী (৩৬৮৫), সহীহ মুসলিম (২৩৮৯)।

(১১০) সহীহ আল-বুখারী (৩১৪০, ৩৫০২, ৪২২৯)।

(১১১) তাফসির আল-মানার (৬/৩৮৪-৩৮৭)।

❍❍❍

মক্কা এবং মদীনার পথিমধ্যে একটি জলাধার, দুই শ্রেষ্ঠ ভূমির মাঝে একটুকরো স্থান।
যেখানে থেমেছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার- পরিজন এবং সংগী-সাথীদের নিয়ে, সবাইকে ডেকে জড়ো করেছিলেন, উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সম্বোধণ করেছিলেন সবাইকে, যেন পৃথিবী শুনতে পায় তাঁর কথা এবং উপদেশকে, অনুভব করতে পারে হৃদয়স্থ আবেগকে, যা তিনি পোঁছে দিতে চেয়েছিলেন সকলের নিকট।
সেটি ছিলো তাঁর শেষ খুতবাগুলোর একটি, যখন তিনি জীবন সফর পরিসমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে।
পাঠককে সাথে নিয়ে ছোট্র এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরচক্ষু দিয়ে সেখানে সেভাবেই দাঁড়ানোর চেষ্টা করবো যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে সাহাবীরা দাঁড়িয়েছিলেন..., আবেগ-অনুভূতির মিশেলে শুনতে চেষ্টা করবো যেমনভাবে তাঁরা শুনেছিলেন... অন্তরের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করবো নবীজী যা বলেছেন সেদিন, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করবো যা আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে সে ঘটনা সম্পর্কে।
বস্তুত:হৃদয়ের ভালোবাসা বিবেকের পথকে আগলে দাড়ায়না, অথবা ভাবনার স্রোত আবেগের সলতেকে নিভিয়ে দেয়না... চলুন তাহলে সেই জলাধারের পাড়ে, যেখানে ঘটেছে এই ঘটনা, ঘোষিত হয়েছে মর্যাদার অবিস্বরণীয় এক ইশতেহার!